সাহিত্যচর্চা

উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য সংকলন

বাংলা ক । দ্বাদশ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে দ্বাদশ শ্রেণির
ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।
বিক্রয়যোগ্য নয়।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

প্রথম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সংস্করণ
এপ্রিল, ২০১৭

প্রকাশক
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁদের অনুমতিতে রচনাগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হল তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

বিশেষজ্ঞ কমিটি, (বিদ্যালয় শিক্ষা)
পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে **সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে **সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম** এবং **উপাসনার স্বাধীনতা; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা** এবং তাদের সকলের মধ্যে **ব্যক্তির মর্যাদা** এবং **জাতীয় ঐক্য ও সংহতি** সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে **ভ্রাতৃত্বের ভাব,** গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, **আমাদের গণপরিষদে,** আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই **সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ** এবং **নিজেদের অর্পণ** করছি।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC AND TO SECURE TO ALL ITS CITIZENS :**

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

প্রস্তাবনা

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ২০১৩ সাল থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য সমস্ত বিষয়ের নতুন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রচলন করেছে।

প্রথম ভাষা 'বাংলা'-র নতুন পাঠ্যপুস্তক 'সাহিত্যচর্চা'র প্রথম উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ সংস্করণ প্রকাশিত হল। এটি দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্য নির্বাচিত গদ্য, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক ইত্যাদির সংকলন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের এই বইটিকেই অনুসরণ করতে হবে।

একাদশ শ্রেণির বাংলা প্রথম ভাষার 'সাহিত্যচর্চা' পুস্তকটির মতোই দ্বাদশ শ্রেণির সংকলনটি বৈচিত্র্য আর উপস্থাপনায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। পাশাপাশি, বইটিতে সংযোজিত হয়েছে 'প্রবন্ধ রচনারীতি' অংশ। উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্যবোধ ও সৃষ্টিশীল ভাবনার বিকাশে, আশা করি, পাঠ্যপুস্তকটি যথাযথ ভূমিকা পালন করবে। পুস্তকে জাতীয় আর আন্তর্জাতিক স্তরের লেখকদের রচনা সে-কারণেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই সংকলনে যে সকল বরেণ্য লেখক-লেখিকার রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলি মুদ্রণের অনুমতি প্রদান করে তাঁরা বা তাঁদের পরিবারবর্গ আমাদের বাধিত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' (বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর) পুস্তক প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেছেন। সংসদের পক্ষ থেকে এঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ডঃ মহুয়া দাস
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যামিক শিক্ষা সংসদ

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
(চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

মহুয়া দাস
(সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ)

রথীন্দ্রনাথ দে
(সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

স দ স্য

ঋত্বিক মল্লিক   রুদ্রশেখর সাহা

প্র চ্ছ দ

শান্তনু দে

রূ পা য় ণ

বিপ্লব মণ্ডল

সূ|চি|প|ত্র

পর্ব : এক

গল্প

কে বাঁচায়, কে বাঁচে	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
ভাত	মহাশ্বেতা দেবী	৮
ভারতবর্ষ	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	১৬

কবিতা

রূপনারানের কূলে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৩
শিকার	জীবনানন্দ দাশ	২৪
মহুয়ার দেশ	সমর সেন	২৬
আমি দেখি	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	২৮
ক্রন্দনরতা জননীর পাশে	মৃদুল দাশগুপ্ত	২৯

নাটক (যে-কোনো একটি)

বিভাব	শম্ভু মিত্র	৩৩
নানা রঙের দিন	অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯

আন্তর্জাতিক কবিতা

পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন	বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট (অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ)	৬১

ভারতীয় গল্প

অলৌকিক	কর্তার সিং দুগ্‌গাল (অনুবাদ : অনিন্দ্য সৌরভ)	৬৫

পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ

আমার বাংলা	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৬৯

তারকা (★) চিহ্নিত রচনাগুলি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত

পর্ব : দুই

প্রবন্ধ রচনারীতি – নির্দেশিকা ও নমুনা	১৪০

গল্প

কে বাঁচায়, কে বাঁচে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন আপিস যাবার পথে মৃত্যুঞ্জয় প্রথম মৃত্যু দেখল— অনাহারে মৃত্যু। এতদিন শুধু শুনে আর পড়ে এসেছিল ফুটপাথে মৃত্যুর কথা, আজ চোখে পড়ল প্রথম। ফুটপাথে হাঁটা তার বেশি প্রয়োজন হয় না। নইলে দর্শনটা অনেক আগেই ঘটে যেত সন্দেহ নেই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু'পা হেঁটেই সে ট্রামে ওঠে, নামে গিয়ে প্রায় অফিসেরই দরজায়। বাড়িটাও তার শহরের এমন এক নিরিবিলি অঞ্চলে যে সে পাড়ায় ফুটপাথও বেশি নেই, লোকে মরতেও যায় না বেশি। চাকর ও ছোটো ভাই তার বাজার ও কেনাকাটা করে।

কয়েক মিনিটে মৃত্যুঞ্জয়ের সুস্থ শরীরটা অসুস্থ হয়ে গেল। মনে আঘাত পেলে মৃত্যুঞ্জয়ের শরীরে তার প্রতিক্রিয়া হয়, মানসিক বেদনাবোধের সঙ্গে চলতে থাকে শারীরিক কষ্টবোধ। আপিসে পৌঁছে নিজের ছোটো কুঠরিতে ঢুকে সে যখন ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল, তখন সে রীতিমতো কাবু হয়ে পড়েছে। একটু বসেই তাই উঠে গেল কলঘরে । দরজা বন্ধ করে বাড়ি থেকে পেট ভরে যত কিছু খেয়ে এসেছিল ভাজা, ডাল, তরকারি, মাছ, দই আর ভাত, প্রায় সব বমি করে উগরে দিল।

পাশের কুঠরি থেকে নিখিল যখন খবর নিতে এল, কলঘর থেকে ফিরে মৃত্যুঞ্জয় কাঁচের গ্লাসে জল পান করছে। গ্লাসটা খালি করে নামিয়ে রেখে সে শূন্যদৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল।

আপিসে সে আর নিখিল প্রায় সমপদস্থ। মাইনে দুজনের সমান, একটা বাড়তি দায়িত্বের জন্য মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চাশ টাকা বেশি পায়। নিখিল রোগা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং একটু আলসে প্রকৃতির লোক। মৃত্যুঞ্জয়ের দু'বছর আগে বিয়ে করে আট বছরে সে মোটে দু'টি সন্তানের পিতা হয়েছে। সংসারে তার নাকি মন নেই। অবসর জীবনটা সে বই পড়ে আর একটা চিন্তাজগৎ গড়ে তুলে কাটিয়ে দিতে চায়।

অন্য সকলের মতো মৃত্যুঞ্জয়কে সেও খুব পছন্দ করে। হয়তো মৃদু একটু অবজ্ঞার সঙ্গে ভালোও বাসে। মৃত্যুঞ্জয় শুধু নিরীহ শান্ত দরদী ভালো মানুষ বলে নয়, সৎ ও সরল বলেও নয়, মানবসভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে পচা ঐতিহ্য আদর্শবাদের কল্পনা-তাপস বলে। মৃত্যুঞ্জয় দুর্বলচিত্ত ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী হলে কোনো কথা ছিল না, দুটো খোঁচা দিয়ে ক্ষেপিয়ে তুললেই তার মনের পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার বেরিয়ে এসে তাকে অবজ্ঞেয় করে দিত। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শ্লথ, নিস্তেজ নয়। শক্তির একটা উৎস আছে তার মধ্যে, অব্যয়কে শব্দরূপ দেবার চেষ্টায় যে শক্তি বহু ক্ষয় হয়ে গেছে মানুষের জগতে তারই একটা অংশ। নিখিল পর্যন্ত তাই মাঝে মাঝে কাবু হয়ে যায় মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে। মৃদু ঈর্ষার সঙ্গেই সে তখন ভাবে যে নিখিল না হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হলে মন্দ ছিল না।

মৃত্যুঞ্জয়ের রকম দেখেই নিখিল অনুমান করতে পারল, বড়ো একটা সমস্যার সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়েছে এবং শার্সিতে আটকানো মৌমাছির মতো সে মাথা খুঁড়ছে সেই স্বচ্ছ সমস্যার অকারণ অর্থহীন অনুচিত কাঠিন্যে।

কী হল হে তোমার? নিখিল সন্তর্পণে প্রশ্ন করল।

'মরে গেল! না খেয়ে মরে গেল!' আনমনে অর্ধ-ভাষণে যেন আর্তনাদ করে উঠল মৃত্যুঞ্জয়।

আরও কয়েকটা প্রশ্ন করে নিখিলের মনে হলো, মৃত্যুঞ্জয়ের ভিতরটা সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। ফুটপাথে অনাহারে মৃত্যুর মতো সাধারণ সহজবোধ্য ব্যাপারটা সে ধারণা করতে পারছে না। সেটা আশ্চর্য নয়। সে এক সঙ্গে পাহাড়প্রমাণ মালমশলা ঢোকাবার চেষ্টা করছে তার ক্ষুদ্র ধারণাশক্তির থলিটিতে। ফুটপাথের ওই বীভৎসতা ক্ষুধা অথবা মৃত্যুর রূপ? না খেয়ে মরা কী ও কেমন? কত কষ্ট হয় না খেয়ে মরতে, কী রকম কষ্ট? ক্ষুধার যাতনা বেশি না মৃত্যুযন্ত্রণা বেশি—ভয়ংকর?

অথচ নিখিল প্রশ্ন করলে সে জবাবে বলল অন্য কথা।– 'ভাবছি, আমি বেঁচে থাকতে যে লোকটা না খেয়ে মরে গেল, এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কী? জেনে-শুনেও এতকাল চার বেলা করে খেয়েছি পেট ভরে। যথেষ্ট রিলিফ ওয়ার্ক হচ্ছে না লোকের অভাবে আরও এদিকে ভেবে পাই না কী করে সময় কাটাবে। ধিক। শত ধিক্ আমাকে।'

মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ ছল ছল করছে দেখে নিখিল চুপ করে থাকে। দরদের চেয়ে ছোঁয়াচে কিছুই নেই এ জগতে। নিখিলের মনটাও খারাপ হয়ে যায়। দেশের সমস্ত দরদ পুঞ্জীভূত করে ঢাললেও এ আগুন নিভবে না ক্ষুধার, অন্নের বদলে বরং সমিধে পরিণত হয়ে যাবে। ভিক্ষা দেওয়ার মতো অস্বাভাবিক পাপ যদি আজও পুণ্য হয়ে থাকে, জীবনধারণের অন্নে মানুষের দাবি জন্মাবে কীসে? রূঢ় বাস্তব নিয়মকে উল্টে মধুর আধ্যাত্মিক নীতি

করা যায়, কিন্তু সেটা হয় অনিয়ম। চিতার আগুনে যত কোটি মড়াই এ পর্যন্ত পোড়ানো হয়ে থাক, পৃথিবীর সমস্ত জ্যান্ত মানুষগুলিকে চিতায় তুলে দিলে আগুন তাদেরও পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

বিক্ষুব্ধ চিত্তে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে নিখিল সংবাদপত্রটি তুলে নিল। চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে নজরে পড়ল, ভালোভাবে সদ্গতির ব্যবস্থা করে গোটা কুড়ি মৃতদেহকে স্বর্গে পাঠানো হয়নি বলে একস্থানে তীক্ষ্ণ ধার হা-হুতাশ করা মন্তব্য করা হয়েছে।

কদিন পরেই মাইনের তারিখ এল। নিখিলকে প্রতিমাসে তিন জায়গায় কিছু কিছু টাকা পাঠাতে হয়। মানি-অর্ডারের ফর্ম আনিয়ে কলম ধরে সে ভেবে ঠিক করবার চেষ্টা করছে তিনটে সাহায্যই এবার পাঁচ টাকা করে কমিয়ে দেবে কিনা। মৃত্যুঞ্জয় ঘরে এসে বসল। সেদিনের পর থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর হয়ে আছে। নিখিলের সঙ্গেও বেশি কথা বলেনি।

‘একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই।’ মৃত্যুঞ্জয় একতাড়া নোট নিখিলের সামনে রাখল।

–‘টাকাটা কোনো রিলিফ ফান্ডে দিয়ে আসতে হবে।’

‘আমি কেন?’

‘আমি পারব না।’

নিখিল ধীরে ধীরে টাকাটা গুনল।

‘সমস্ত মাইনেটা?’

‘হ্যাঁ।’

‘বাড়িতে তোর ন’জন লোক। মাইনের টাকায় মাস চলে না। প্রতিমাসে ধার করছিস।’

‘তা হোক। আমায় কিছু একটা করতে হবে ভাই। রাতে ঘুম হয় না, খেতে বসলে খেতে পারি না। এক বেলা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমার আর টুনুর মা’র এক বেলার ভাত বিলিয়ে দি।’

নিখিল এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। জ্বর হলে যেমন দেখায় মৃত্যুঞ্জয়ের গোলগাল মুখখানা তেমনি থম থম করছে। ভেতরে সে পুড়ছে সন্দেহ নেই।

‘টুনুর মার যা স্বাস্থ্য, একবেলা খেয়ে দিন পনেরো কুড়ি টিকতে পারবে।’

মন্তব্য শুনে মৃত্যুঞ্জয় ঝাঁঝিয়ে উঠল।– ‘আমি কী করব? কত বলেছি, কত বুঝিয়েছি, কথা শুনবে না। আমি না খেলে উনিও খাবেন না। এ অন্যায় নয়? অত্যাচার নয়? মরে তো মরবে না খেয়ে।’

নিখিল ভাবছিল বন্ধুকে বুঝিয়ে বলবে, এ ভাবে দেশের লোককে বাঁচানো যায় না। যে অন্ন পাওয়া যাচ্ছে সে অন্ন তো পেটে যাবেই কারো না কারো। যে রিলিফ চলছে তা শুধু একজনের বদলে আরেকজনকে খাওয়ানো।

এতে শুধু আড়ালে যারা মরছে তাদের মরতে দিয়ে চোখের সামনে যারা মরছে তাদের কয়েকজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করার সান্ত্বনা। কিন্তু এসব কোনো কথাই সে বলতে পারল না, গলায় আটকে গেল।

সে শুধু বলল,– 'ভূরিভোজনটা অন্যায়, কিন্তু না খেয়ে মরাটা উচিত নয় ভাই। আমি কেটে ছেঁটে যতদূর সম্ভব খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি। বেঁচে থাকতে যতটুকু দরকার খাই এবং দেশের সমস্ত লোক মরে গেলেও যদি সেইটুকু সংগ্রহ করার ক্ষমতা আমার থাকে, কাউকে না দিয়ে নিজেই আমি তা খাব। নীতিধর্মের দিক থেকে বলছি না, সমাজধর্মের দিক থেকে বিচার করলে দশজনকে খুন করার চেয়ে নিজেকে না খাইয়ে মারা বড়ো পাপ।

'ওটা পাশবিক স্বার্থপরতা।'

'কিন্তু যারা না খেয়ে মরছে তাদের যদি এই স্বার্থপরতা থাকত? এক কাপ অখাদ্য গ্রুয়েল দেওয়ার বদলে তাদের যদি স্বার্থপর করে তোলা হতো? অন্ন থাকতে বাংলায় না খেয়ে কেউ মরত না। তা সে অন্ন হাজার মাইল দূরেই থাক আর একত্রিশটা তালা লাগানো গুদামেই থাক।'

'তুই পাগল নিখিল। বদ্ধ পাগল।' বলে মৃত্যুঞ্জয় উঠে গেল।

তারপর দিন দিন কেমন যেন হয়ে যেতে লাগল মৃত্যুঞ্জয়। দেরি করে আপিসে আসে, কাজে ভুল করে, চুপ করে বসে ভাবে, এক সময় বেরিয়ে যায়। বাড়িতে তাকে পাওয়া যায় না। শহরের আদি অন্তহীন ফুটপাথ ধরে সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ডাস্টবিনের ধারে, গাছের নীচে, খোলা ফুটপাথে যারা পড়ে থাকে, অনেক রাত্রে দোকান বন্ধ হলে যারা হামাগুড়ি দিয়ে সামনের রোয়াকে উঠে একটু ভালো আশ্রয় খোঁজে, ভোর চারটে থেকে যারা লাইন দিয়ে বসে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয় তাদের লক্ষ করে। পাড়ায় পাড়ায় লঙ্গরখানা খুঁজে বার করে অন্নপ্রার্থীর ভিড় দেখে। প্রথম প্রথম সে এইসব নরনারীর যতজনের সঙ্গে সম্ভব আলাপ করত। এখন সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। সকলে এক কথাই বলে। ভাষা ও বলার ভঙ্গি পর্যন্ত তাদের এক ধাঁচের। নেশায় আচ্ছন্ন অর্ধচেতন মানুষের প্যানপ্যানানির মতো ঝিমানো সুরে সেই এক ভাগ্যের কথা, দুঃখের কাহিনি। কারো বুকে নালিশ নেই, কারো মনে প্রতিবাদ নেই। কোথা থেকে কীভাবে কেমন করে সব ওলটপালট হয়ে গেল তারা জানেনি, বোঝেনি, কিন্তু মেনে নিয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির অবস্থা শোচনীয়। টুনুর মা বিছানা নিয়েছে। বিছানায় পড়ে থেকেই সে বাড়ির ছেলে-বুড়ো সকলকে তাগিদ দিয়ে দিয়ে স্বামীর খোঁজে বার বার বাইরে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এই বিরাট শহরের কোথায় আগন্তুক মানুষের কোন জঞ্জালের মধ্যে তাকে তারা খুঁজে বার করবে! কিছুক্ষণ বাইরে কাটিয়ে তারা ফিরে আসে, টুনুর মাকে মিথ্যা করে বলে যে মৃত্যুঞ্জয় আসছে–খানিক পরেই আসছে। খবর দিয়ে বাড়ির সকলে কেউ গম্ভীর, কেউ কাঁদ কাঁদ মুখ করে বসে থাকে, ছেলেমেয়েগুলি অনাদরে অবহেলায় ক্ষুধার জ্বালায় চেঁচিয়ে কাঁদে।

নিখিলকে বার বার আসতে হয়। টুনুর মা তাকে সকাতরে অনুরোধ জানায়, সে যেন একটু নজর রাখে মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে, একটু যেন সে সঙ্গে থাকে তার।

নিখিল বলে, ‘আপনি যদি সুস্থ হয়ে উঠে ঘরের দিকে তাকান তাহলে যতক্ষণ পারি সঙ্গে থাকব, নইলে নয়।’

টুনুর মা বলে, ‘উঠতে পারলে আমিই তো ওর সঙ্গে ঘুরতাম ঠাকুরপো।’

‘ঘুরতেন?’

‘নিশ্চয়। ওঁর সঙ্গে থেকে থেকে আমিও অনেকটা ওঁর মতো হয়ে গেছি। উনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন, আমারও মনে হচ্ছে যেন পাগল হয়ে যাব। ছেলেমেয়েগুলির জন্য সত্যি আমার ভাবনা হয় না। কেবলি মনে পড়ে ফুটপাথের ওই লোকগুলির কথা। আমাকে দু’তিন দিন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।’

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে টুনুর মা আবার বলে, ‘আচ্ছা, কিছুই কি করা যায় না?’ এই ভাবনাতেই ওঁর মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কেমন একটা ধারণা জন্মেছে, যথাসর্বস্ব দান করলেও কিছুই ভালো করতে পারবেন না। দারুণ একটা হতাশা জেগেছে ওর মনে। একেবারে মুষড়ে যাচ্ছেন দিনকে দিন।’

নিখিল শোনে আর তার মুখ কালি হয়ে যায়।

মৃত্যুঞ্জয় আপিসে যায় না। নিখিল চেষ্টা করে তার ছুটির ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছে। আপিসের ছুটির পর সে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে যায়—মৃত্যুঞ্জয়ের ঘোরাফেরার স্থানগুলি এখন অনেকটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেও মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কাটিয়ে দেয়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে তাকে উল্টো কথা শোনায়, নিজের আগেকার যুক্তিতর্কগুলি নিজেই খণ্ড খণ্ড করে দেয়। মৃত্যুঞ্জয় শোনে কিন্তু তার চোখ দেখেই টের পাওয়া যায় যে কথার মানে সে আর বুঝতে পারছে না, তার অভিজ্ঞতার কাছে কথার মারপ্যাঁচ অর্থহীন হয়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে নিখিলকে হাল ছেড়ে দিতে হয়।

তারপর মত্যুঞ্জয়ের গা থেকে ধূলিমলিন সিল্কের জামা অদৃশ্য হয়ে যায়। পরনের ধুতির বদলে আসে ছেঁড়া ন্যাকড়া, গায়ে তার মাটি জমা হয়ে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। দাড়িতে মুখ ঢেকে যায়। ছোটো একটি মগ হাতে আরও দশজনের সঙ্গে সে পড়ে থাকে ফুটপাথে আর কাড়াকাড়ি মারামারি করে লঙ্গরখানার খিচুড়ি খায়। বলে, ‘গাঁ থেকে এইছি । খেতে পাইনে বাবা। আমায় খেতে দাও!’

ভাত

মহাশ্বেতা দেবী

লোকটার চাহনি বড়ো বাড়ির বড়ো বউয়ের প্রথম থেকেই ভালো লাগেনি। কী রকম যেন উগ্র চাহনি। আর কোমর পর্যন্ত ময়লা লুঙ্গিটা অত্যন্তই ছোটো। চেহারাটা বুনো বুনো। কিন্তু বামুন ঠাকুর বলল, ভাত খাবে কাজ করবে।

কোথা থেকে আনলে?

এ সংসারে সব কিছুই চলে বড়ো পিসিমার নিয়মে। বড়ো পিসিমা বড়ো বউয়ের পিসি শাশুড়ি হন। খুবই অদ্ভুত কথা। তাঁর বিয়ে হয়নি।

সবাই বলে, সংসার ঠেলবার কারণে অমন বড়োলোক হয়েও ওরা মেয়ের বিয়ে দেয়নি। তখন বউ মরে গেলে বুড়ো কর্তা সংসার নিয়ে নাটা-ঝামটা হচ্ছিল।

বড়ো বাড়ির লোকেরা বলে, ওঁর বিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে। উনি হলেন দেবতার সেবিকা।

বড়ো বাড়িতে শিবমন্দিরও আছে একটা। বুড়ো কর্তা এ রাস্তার সবগুলো বাড়িই শিব-মহেশ্বর-ত্রিলোচন-উমাপতি, এমন বহু নামে শিবকে দিয়ে রেখেছিলেন। দূরদর্শী লোক ছিলেন। তাঁর জন্যই এরা করে খাচ্ছে। বড়ো পিসিমা নাকি বলেছিলেন, উনি আমার পতিদেবতা। মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিও না।

এসব কথা সত্যি না মিথ্যে কে জানে। বড়ো পিসিমা চিরকাল এ সংসারে হেঁশেল দেখেছেন, ভাড়াটে বাড়িতে মিস্তিরি লাগিয়েছেন এবং তাঁর বাবার সেবা করেছেন।

বড়ো বউয়ের কথা শুনে বড়ো পিসিমা বলেন, কোথা থেকে আনলে মানে? ঝড়জলে দেশ ভেসে গেছে। আমাদের বাসিনীর কে হয়। সেই ডেকে আনলে।

বড়ো বউ বলে, কী রকম দেখতে!

ময়ূরছাড়া কার্তিক আসবে নাকি? তোমরা তো দশটা পয়সা দিতে পারবে না প্রাণে ধরে। এই চোদ্দো দফায় কাজ করবে, পেটে দুটো খাবে বইতো নয়। কেনা চাল নয়, বাদা থেকে চাল আসছে। তা দিতেও আঙুল বেঁকে যাচ্ছে?

বড়ো বউ চুপ করে যায়। বড়ো পিসির কথায় আজকাল কেমন যেন একটা ঠেস থাকে। 'তোমাদের' মানে কী? বড়ো পিসিমা কি অন্য বাড়ির লোক নাকি?

বড়ো পিসিমা শেষ খোঁচাটা মারেন। তোমার শ্বশুরই মরতে বসেচে বাছা। সে জন্যেই হোম-যজ্ঞি হচ্ছে। তার জন্য একটা লোক খাবে.....

বড়ো বউ কোনো কথা বলে না। সব কথাই সত্যি। তার শ্বশুরই মরতে বসেছেন। বিরাশি বছরটা অনেক বয়েস। কিন্তু শ্বশুর বেশ টনকো ছিলেন। তবে ক্যানসার বলে কথা। ক্যানসার যে লিভারে হয় তাই বড়ো বউ জানতো না। বড়ো বউ প্রায় দৌড়ে চলে যায়।

আজ অনেক কাজ। মেজ বউ উনোন পাড়ে বসেছে। শাশুড়ির মাছ খাওয়া বুঝি ঘুচে যায়। তাই কয়েকদিন ধরে বড়ো ইলিশ, পাকা পোনার পেটি, চিতলের কোল, ডিমপোরা ট্যাংরা, বড়ো ভেটকি মাছের যজ্ঞি লেগেছে। রেঁধে-বেড়ে শাশুড়িকে খাওয়ানো তার কাজ।

শ্বশুরের ঘরে নার্স। বড়ো বউ এখন গেল সে ঘরে। সে একটু বসলে পরে নার্স এসে চা খেয়ে যাবে। সেজ ছেলে বিলেতে। তার আসার কথা ওঠে না। ছোটো মেজ ও বড়ো ঘুমোচ্ছে। এ বাড়ির ছেলেরা বেলা এগারোটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না। সেই জন্যেই তাদের চাকরি করা হয়ে ওঠেনি। আঠারোখানা দেবত্র বাড়ি আর বাদা অঞ্চলে অসাগর জমি থাকলে কাজ বা করে কে?

শ্বশুরের ঘরে বসে বড়ো বউ ভাবতে চেষ্টা করে শ্বশুর নেই, সে অবস্থাটা কেমন হবে। ক্যানসার, লিভারে ক্যানসার, তা আগে বোঝা যায়নি। বোঝা গেল যখন, তখন আর কিছু করবার নেই। বড়ো বউ ভাবতে চেষ্টা করে, তখনও চাঁদ সূর্য উঠবে কি না। শ্বশুর তার কাছে ঠাকুরদেবতা সমান।

তাঁর জন্য দই পেতে ইসবগুল দিয়ে শরবত করে দিতে হতো, শত ঠাকুর আসুক, তিনি খেতে আসার পাঁচ মিনিট আগে বড়ো বউকে করতে হতো রুটি-লুচি। তাঁর বিছানা পাততে হতো, পা টিপতে হতো। কত কাজ করতে হত সারা জীবন ধরে। এখন সে সব কি আর করতে হবে না, কে জানে।

ডাক্তাররা বলে দিয়েছে বলেই তো আজ এই যজ্ঞি-হোম হচ্ছে। ছোটো বউয়ের বাবা এক তান্ত্রিক এনেছেন। বেল, ক্যাওড়া, অশ্বত্থ, বট, তেঁতুল গাছের কাঠ এসেছে আধ মন করে। সেগুলো সব এক মাপে কাটতে হবে। কালো বেড়ালের লোম আনতে গেছে ভজন চাকর। শ্মশান থেকে বালি, এমন কত যে ফরমাশ।

তা ওই লোকটাকে ধরে আনা কাঠ কাটার জন্যে। ও নাকি ক'দিন খায়নি। বাসিনী এনেছে। বাদায় থাকে, অথচ ভাতের আহিংকে এতখানি। এ আবার কী কথা? বাদায় চালের অভাব নাকি? দেখো না একতলায় গিয়ে। ডোলে ডোলে কত রকম চাল থরে থরে সাজানো আছে।

নার্স এসে বসে। বড়ো বউ নেমে যায়। আজ খাওয়া-দাওয়া ঝপ্ করে সারতে হবে তান্ত্রিক হোমে বসবার আগে। হোম করে তান্ত্রিক শ্বশুরের প্রাণটুকু ধরে রাখবেন। তান্ত্রিক নীচের হল-ঘরে বসে আছেন।

বড়ো পিসিমা বলেন, নামতে পারলে বাছা? চালগুলো তো বের করে দেবে?

—এই যে দিই।

ঝিঙেশাল চালের ভাত নিরামিষ ডাল তরকারির সঙ্গে। রামশাল চালের ভাত মাছের সঙ্গে। বড়োবাবু কনকপানি চাল ছাড়া খান না, মেজো আর ছোটোর জন্য বারোমাস পদ্মজালি চাল রান্না হয়। বামুন চাকর ঝি-দের জন্য মোচা সাপ্‌টা চাল। বাদার লোকটি কাঠ কাটতে কাটতে চোখ তুলে দেখে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে তার।

—হ্যাঁ। বাসিনী, এত নানানিধি চাল?

—বাবুরা খায়।

— ওই পাঁচ ভাগে ভাত হয়?

—হবে নে? বাদায় এদের এত জমি। চাল এনে পাহাড় করেচে। বড়ো পিসিমা বেচেও দিচ্ছে নুক্কে নুক্কে। আমিই বেচতেছি সে চাল।

—বাদায় এদের চাল হয়! তা দে দেখি বাসিনী। এক মুষ্ঠি চাইল দে। গালে দে জল খাই। বড্ড ঝ্যামন আঁচড় কাটতিছে পেটের মদ্যিখানে। সেই ক'দ্দিন ঘরে আঁদা ভাত খাই না। দে বাসিনী ব্যাগ্যতা করি তোর।

—আরে আরে! কর কি উচ্ছব দাদা। গাঁ সম্পক্কে দাদা তো হও। কেন বা এমন করতেছ। পিসিমা দেকতে পেলে সব্বনাশ হবে। আমি ঠিক তাগেবাগে দে ঝাব। তুমি হাত চালিয়ে নাও দেকি বাবা। এদেরকে বলিহারি ঝাই। এট্টা লোক কদিন খায়নি শুনচ। আগে চাট্টি খেতে দে।

বাসিনী চালগুলি নিয়ে চলে যাবার সময়ে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে যায়। লোকটির নাম উৎসব। চিরকালই যে উচ্ছব নাইয়া নামে পরিচিত। গত কয়েকদিন সে সত্যিই খায়নি। কপালটা মন্দ তার। বড়োই মন্দ। যত দিন রান্না খিচুড়ি দেয়া হচ্ছিল ততদিন সে খেতে পারেনি। অ চন্নুনীর মা। চন্নুনীরে! তোমরা রা কাড় না ক্যান—কোতা অইলে গো!

বস্তুত এ সব বলে সে যখন খুঁজছিল বউ ছেলে মেয়েকে তখন তার বুদ্ধি হরে গিয়েছিল। একদিন তুমুল ঝড়বৃষ্টি। ছেলে-মেয়েকে জাপটে-সাপটে ধরে বউ কাঁপছিল শীতে আর ভয়ে। সে ঘরের মাঝ-খুঁটি ধরে মাটির দিকে দাবাচ্ছিল। মাঝ-খুঁটিটি মাতাল আনন্দে টলছিল, ধনুষ্টঙ্কার রোগীর মতো কেঁপেঝেঁকে উঠছিল। উচ্ছব বলে চলছিল ভগমান! ভগমান! ভগমান! কিন্তু এমন দুর্যোগে ভগবান ও কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুমোন বোধ করি। ভগমান! ভগমান! উচ্ছব বলছিল। এমন সময়ে মাতলার জল বাতাসের চাবুকে ছটফটিয়ে উঠে এসেছিল। জল উঠল। জল নামল! উচ্ছবদের সংসার মাটিতে লুটোপুটি গেল।

সকাল হতেই বোঝা গিয়েছিল সর্বনাশের বহরখানা। তারপর কয়েকদিন ধরে ঘরের চালের নীচ থেকে কোনো সাড়া পাবার আশায় উচ্ছব পাগল হয়ে থাকে। কে, কোথায়, পাগল নাকি উচ্ছব? সাধন দাশের কথা উচ্ছব নেয় না। সাধন বলে, তোরেও তো টেনে নেচ্ছেল। গাচে বেধে রয়ে গেলি। উচ্ছব বলে, রা কাড় অ চন্নুনীর মা! ঘরের পাশ ছেড়ে সে নড়তে চায় না। তা ছাড়া টিনের বেশ একটা মুখবন্ধ কৌটো ছিল ঘরে। তার মধ্যে ছিল নিভুঁই উচ্ছবের জমি-চেয়ে দরখাস্তের নকল। উচ্ছব নাইয়া। পিং হরিচরণ নাইয়া। সে কৌটোটা বা কোথায়।

যা আর নেই, যা ঝড়-জল-মাতলার গর্ভে গেছে তাই খুঁজে খুঁজে উচ্ছব পাগল হয়েছিল। তাই রান্না খিচুড়ি তার খাওয়া হয়নি। তারপর যখন তার সম্বিত ফিরল, তখন আর খিচুড়ি নেই। ড্রাইডোল। চালগুলি সে চিবিয়ে জল খেয়েছিল। এভাবে কিছুদিন যায়। তারপর গ্রামের লোকজন বলে, মরেচে যারা তাদের ছরাদ্দ কত্তে হয়। একাজ করার জন্যে তারা মহানাম শতপথিকে খবর দেয়। কিন্তু মহানাম এখন আর দুটো গ্রামে অনুরূপ শ্রাদ্ধশান্তি সেরে তবে এখানে আসবে। গ্রামবাসী অন্যেরা মাছ-গুগলি-কাঁকড়া যা পাচ্ছে ধরতে লেগেছে। উচ্ছবকে সাধন বলে, তুমি একা কলকেতা যাব বলে নেচেই বা উটলে কেন? সরকার ঘর কত্তে খরচা দেবে শুনছ না?

উচ্ছব হঠাৎ খুব বুদ্ধিমান সাজতে চায় ও বলে, সে এট্টা কতা বটে।

ঝড় জলে কার কী হলো, মা-ভাই-বোন আছে না গেছে দেখতে বাসিনী আসতে পারেনি। তার বোন আর ভাজ কলকাতা যাচ্ছিল। ওরা কিছুকাল ঠিকে কাজ করবে। উচ্ছব আগেও গিয়েছিল একবার। বাসিনী যেখানে কাজ করে সে ঘর বাড়ি দেখেছিল বাইরে থেকে। বার-বাড়িতে ঠাকুর দালান আছে, মন্দিরের মাথায় পেতলের ত্রিশূলটা দেখেছিল। বাসিনীর মনিব বাড়িতে হেলা ঢেলা ভাত, এ গল্প গ্রামে সবাই শুনেছে। উচ্ছবের হঠাৎ মনে হয় কলকাতা গিয়ে খেয়ে মেখে আসি। কেন মনে হয়েছিল তা সে বলতে পারে না। উপোসে, এক রাতে বউ ছেলে মেয়ে ঘরদোর হারিয়ে সে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছিল। মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করে, কোনো কথা গুছিয়ে ভাবতে পারে না। খুব ভাবে সে, না না। এইবার গুচিয়ে ভাবতে হচ্ছে। কী যে হলো তা একনো দিশে হচ্ছে না তেমন। ভাবতে গেলেই তার প্রথমে মনে হয় ধানে গোছ আসার আগেই ধান গাছ থেকে সবুজ রং চলে যেতে থাকে। কার্তিক মাসেই ধান খড় হয়ে গেল। তা দেখে উচ্ছব মাথায় হাত দিয়েছিল। সতীশ মিস্তিরির হরকুল, পাটনাই, মোটা তিন ধানে মড়ক। উচ্ছব তো সতীশের কাজ করেই ক'মাস বেঁচে থাকে। অ উচ্ছব, মনিবের ধান যায় তো তুই কাঁদিস কেন? কাঁদব না, সাধনবাবু, কাঁদব না? লক্ষ্মী না আসতে সেধে ভাসান যাচ্ছে তা কাঁদব না এতটুকু? আমরা খাব কী?

তা গুছিয়ে চিন্তা করতে বসলে আগে মনে হয় ধানক্ষেতে আগুন লাগার কথা। তারপরই মনে পড়ে যে রাতে ঝড় হয়। সেই সন্ধেয় অনেকদিন বাদে সে পেট ভরে খেয়েছিল। এই এত হিঞ্চে সেদ্দ আর এত গুগলি সেদ্দ নুন আর লঙ্কা পোড়া দিয়ে। দিনটা এমন ছিল যে সেদিন গ্রামের সকল উচ্ছবরা ভরা পেট খেয়েছিল। খেতে খেতে চন্নুনীর মা বলেছিল—দেবতার গতিক ভালো নয়কো। লৌকো নে ঝারা বেইরেচে বুজি বা বোট মারা পরে, এ কথাটাও বেশ মনে পড়ে। তারপরেই মনে পড়ে মাঝ-খুঁটিটা সে মাটির দিকে ঠেলে ধরে আছে। মা বসুমতী ঝেমন সে খুঁটি রাখতে চায়নে, উগরে ফেলে দেবে। ভগমান! ভগমান! ভগমান! তারপর বিদ্যুচ্চমকে ক্ষণিক আলোয় দেখা মাতলার সফেন জল ছুটে আসছে। ব্যাস্, সব খোলামেলা, একাকার তারপর থেকে। কী হল। কোথায় গেল সব, তুমি কোথায়, আমি কোথায়। উচ্ছব নাইয়া। পিং হরিচরণ নাইয়া। কাগজসহ কৌটোটি

কোথায়। বড়ো সুন্দর কৌটোখানি গো! চন্নুনীদের যদি রেখে যেত ভগবান, তাহলে উচ্ছবের বুকে শত হাতির বল থাকত আজ। তাহলে সে কৌটো নিয়ে সবাই ভিক্ষেয় বেরত। সতীশবাবুর নাতি ফুট খায়। উচ্ছব কৌটোটো চেয়ে এনেছিল। অমন কৌটো থাকলে দরকারে একমুঠো ফুটিয়ে নেয়া যায়। চমৎকার কৌটো।

—কী হলো, হাত চালাও বাছা। ওদিকে শুষচে কত্তা, হোম হবে, তা কাটগুনো দাঁড়িয়ে দেখচ? বড়ো পিসিমা খনখনিয়ে ওঠে।

—বড়ো খিদে নেগেচে মা গো!

—এই শোন কতা! ভাত নামলেও খাওয়া নেই একন। তান্ত্রিকের নতুন বিধেন হল, সর্বস্ব রেঁধে রাখো, হোম হলে খেও। তুমি হাত চালাও।

উচ্ছব আবার কাঠ কাটতে থাকে। প্রত্যেকটি কাঠ দেড় হাত লম্বা হবে। ধারালো কাটারিটি সে তোলে ও নামায়। ফুটন্ত ভাতের গন্ধ তাকে বড়ো উতলা করে। এদিক ওদিক চেয়ে বাসিনী ঝুড়ি বোঝাই শাক নিয়ে উঠোনে ধুতে আসে। ঝপ করে একটা ঠোঙা তার হাতে দিয়ে বলে, ছাতু খেয়ে জল খেয়ে এসো রাস্তার কল হতে। দেরি কোরো না মোটে। এ পিশাচের বাড়ি কেমন তা ঝাননি দাদা। গরিবের গতর এরা শস্তা দেকে।

—কে মরতেচে হ্যাঁ বাসিনী?

—তেকেলে বুড়ো। বাড়ির কত্তা। মরবেনে? ওই ঝে হোমের জোগান দিচ্ছে, ওই মুটকি ওনার খাস ঝি। কত্তা মোলে পরে ওকে সাত নাতি না মেরেচি তো আমি বাসিনী নই। তেকেলে বুড়ো মরছে তার ঝন্যি হোম!

ছাতু ক'টি নিয়ে উচ্ছব বেরিয়ে যায়। বাপ রে! এত তরকারি, এত চাল এত মাছ এ একটা যজ্ঞি বটে! সব নাকি বাদার দৌলতে। সে কোন বাদা? উচ্ছবের বাদায় শুধু গুগলি-গেঁড়ি-কচুশাক-সুশনো শাক। উচ্ছব ছাতুটুকু একটু খায়, মিষ্টির দোকানে ভাঁড় চেয়ে নিয়ে জল খায়। ছাতু নাকি পেটে পড়লে ফুলে ফেঁপে ওঠে। তাই হোক। পেটের গভর ভরুক। কিন্তু সাগরে শিশির পড়ে। উচ্ছব টের পায় না কিছু। সে আবার ফিরে আসে।

—কোথা গেছলে?

—এট্টু বাইরে গেলাম মা!

কাঠ কাটলে হোম, হোম হলে ভাত, উচ্ছব তাড়াতাড়ি হাত চালায়। মেজ বউ চেঁচিয়ে বলে, খাবার ঘর মুছেচ বাসিনী? সব রান্না তুলতে হবে।

বাসিনী বলে, মুছিচি!

বড়ো বউ হেঁকে বলে, সব হয়ে গেল?

—মাচের ঘরে সব হলো।

এসব কথা শুনে উচ্ছব বুকে বল পায়। ভাত খাবে সে, ভাত। আগে ভাত খাবে, জিবে ভাতের সোয়াদ নেবে। আসার সময়ে গাঁ-জ্ঞেয়াতি বলেছিল, কলকেতা ঝাচ্চ ঝকন, তখন কালীঘাটে ওদের ছরাদ সেরে দিও। অপঘাতে গেচে ওরা; হ্যাঁ, তাও করবে উচ্ছব, মহানাম শতপতি তো এল না। এলে পরে নদীর পাড়ে সারবন্দি ছরাদ হবে। উচ্ছব কালীঘাটে ছরাদ সারবে। সতীশবাবু বলেছে, উচ্ছবের মতিচ্ছন্ন হয়েছে বই তো নয়। বউ ছেলে মেয়ে অপঘাতে মরল, মানুষ পাগল হয়ে যায়। উচ্ছব ভাত ভাত করচে দেখ।

তুমি কী বুঝবে সতীশবাবু! নদীর পাড়েও থাক না, মেটে ঘরেও থাক না। পাকা ঘর কি ঝড় জলে পড়ে? তোমার ধান চালও পাকা ঘরে রেখেছ। চোর ডাকাতে নেবে না। দেশ জোড়া দুর্যোগেও তোমার ঘরে রান্না হয়। ভাত খেতে দিলে না উচ্ছবকে। তোকে এগলা দিলে চলবে? তাহলেই পালে পালে পঙ্গপাল জুটবে নে? এ হলো ভগবানের মার। এর চোট থেকে তোকে বাঁচাতে পারি?—তা তুমি ভাত দিলে না, দেশে ভাত নেই। সেই যে পোকায় ধান নষ্ট, সেই হতেই তো উচ্ছবের আধ-পেটা সিকি-পেটা উপোসের শুরু। পেটে ভাত নেই বলে উচ্ছবও প্রেত হয়ে আছে। ভাত খেলে সে মানুষ হবে। তখন বউ ছেলে মেয়ের জন্যে কাঁদবে। দুঃখ তো ওর হয়নি। ও শুধু পাগল হয়ে বউ মেয়েকে ডেকেছিল কয়েক দিন ধরে। তখনি উচ্ছব প্রেত হয়ে গেছে। মানুষ থাকলে ও ঠিকই বুঝত যে জলের টানে মানুষ ভেসে গেছে। কত গোরু মোষ ভেসে গেল, চন্নুনীর মা তো কোন ছার। উচ্ছব কাঠ কাটা শেষ করে। আড়াই মন কাঠ কাটলো সে ভাতের হুতাশে। নইলে দেহে ক্ষমতা ছিল না।

পাঁচ ভাগে কাঠ রেখে আসে দালানে। উঠোনে কাঠের কুচো, টুকরো সব ঝুড়িতে তুলে উঠোন ঝাঁট দেয়। তারপর বড়ো পিসিমাকে দেখতে পেয়ে শুধোয়, মা! বাইরে ঝেয়ে বসব?

বড়ো পিসিমা তখনই জবাব দেয় না। কেননা তান্ত্রিক হঠাৎ 'ওং হ্রীং ঠং ঠং ভো ভো রোগ শৃণু শৃণু' বলে গর্জে উঠে রোগকে দাঁড় করান, কালো বেড়ালের লোমে রোগকে বেঁধে ফেলেন ও হোম শুরু করেন। একই সঙ্গে ওপর থেকে নার্স নেমে এসে বলে, ডাক্তারকে কল দিন। —বড়ো মেজো ও ছোটো ঘুম ভাঙা চোখে বিরস মুখে হোমের ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, বাসিনী উচ্ছবকে বলে, তুমি ঝেয়ে বাইরে বোসো দাদা। না, মন্তর বললে বটে। ঝেমন হাঁকুড় পাড়লে অমনি কত্তা টাল দিলে? কত্তার দেহ থেকে ব্যাদিটা হাঁচোড় পাঁচোড় করে বেইরে এল। চ্যান করবে তো করে নাও কেন?

—একন চান করব না। মাতায় জল পড়লে পেট মানতে চায়নে মোটে।

বাইরে এসে উচ্ছব শিবমন্দিরের চাতালে বসে। কেমন মন্দির, কেমন চাতাল! বাপরে! এসব নাকি বাদার দৌলতে। সে বাদাটা কোথায় থাকে? ভাত তো খায়নি উচ্ছব অনেক দিন। ভাত খেয়ে দেহে শক্তি পেলে উচ্ছব সেই বাদাটা খুঁজে বের করবে। উচ্ছবের মতো আরো কত লোক আছে দেশে। তাদেরও বলবে।

মন্দিরের চাতালে তাস পেটে তিনটি ছেলে। তারা বলে, বুড়োকে বাঁচিয়ে তুলতে হোম হচ্ছে।

—ফালতু?

—কী ফালতু?

—বেঁচে থেকে ও কত দিন জীবন পাবে? একশো? যত সব ফালতু।

উচ্ছব চোখ বোঁজে। এমন যজ্ঞির পরেও বুড়োকত্তা বেশিদিন বাঁচবে না? কী কাণ্ড! মাতলা নদী যদি সে রাতে পাগল হয়ে মাতাল মাতনে উঠে না আসে তো উচ্ছবের বউ, চন্নুনী, ছোটো খোকা অনেকদিন বঁচে। উচ্ছবের চোখের কোলে জল গড়ায়। ভাত খাবে আজ। সেই আশাতেই প্রেত উচ্ছব মানুষ হয়ে গেল নাকি? বড়ো ছেলে ছোটো খোকার কথা মনে হতে চোখে জল এল হঠাৎ? ভাতই সব। অন্ন লক্ষ্মী, অন্ন লক্ষ্মী, অন্নই লক্ষ্মী, ঠাগমা বলত। ঠাগমা বলত, রন্ন হল মা নক্কী।

—কী হে কানছ কেন?

—আমারে শুদোচ্ছেন বাবু?

—হাঁ হে।

—আবাদ থেকে আসতেছি বাবুগো! ঝড়ে জলে সব নাশ হয়ে, ঘরের মানুষ...

—ও!

তাস পিটানো ছেলেগুলি অস্বস্তিতে পড়ে। বয়স্ক ছেলেটি বলে, ঠিক আছে ভাই ঘুম এসো।

উচ্ছব সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়েই থাকে সে অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ। অবশেষে কার পায়ের ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙে তার।

ইস্! এ যে সাঁঝ বেলা গো। কিন্তু তাকে ঠেলা দিচ্ছে কেন লোকটা?

—ওঠো, ওঠো কে তুমি?

—বাবু...আমি...

—চুরির মতলবে পড়ে আছ?

—না বাবু, এই বাড়িতে কাজ করতেছিলাম।

—ওঠো, ওঠো।

উচ্ছব উঠে পড়ে। তারপর সে অত্যন্ত ঘাবড়ে যায়। রাস্তায় বেশ কয়েকটি গাড়ি। লোকের ছোটো ছোটো জটলা।

—কী হয়েচে বাবু?

কেউই তার কথায় জবাব দেয় না। উচ্ছব বাড়িতে ঢোকে। ঢুকতেই বড়ো পিসিমার বিলাপ শোনে, তোমার ছোটো বেয়াই কি ডাকাতে সন্নেসী আনল গো দাদা! যজ্জি হলো আর তুমিও মল্লে। অ-দাদা! তুমি যে বিরেশিতে যাবে তা কে জানত বল গো! তোমার যে আটানব্বই বচর বেঁচে থাকার কথা গো দাদা।

বাসিনীকে দেখতে পায় না উচ্ছব। তবে খুব কর্মব্যস্ততা দেখে। কেত্তন না এলে বেরুনো নেই। কে যেন বলে।

—কেত্তন কী বলছিস বড়ো খোকা। বোনরা, দিদিরা আসুক। বড়ো পিসিমা বলেন। চন্নন বাটছ কেউ?

—খাটের টাকা কে নিয়েছে?

—বাগবাজারে, ফোন করোচো?

—ফর্দটা দেকে দাও দিকি কেউ। খই, ফুল, ধুতি। শব বস্তর...উচ্ছব পাঁচিলের গায়ে সিঁটিয়ে লেপটে দাঁড়িয়ে থাকে। কত যে সময় যায়, কত কী যে হতে থাকে।

মস্ত খাট আসে। রাতে রাতে বের কত্তে হবে। রাতে রাতে কাজ সারতে হবে। নইলে দোষ লাগবে।

অনেক তোড়জোড় হয়। মেয়েরা বসে কাঁদে। হোম যজ্ঞ করেও বুড়ো কত্তার প্রাণটা যে রইল না, তাতে তান্ত্রিককে এতটুকু কুণ্ঠিত দেখা যায় না। তিনি লাইন করে ফেলেন তাঁর। ফলে বড়ো পিসিমা চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, তিন ছেলে হোম ছেড়ে উঠে গেল যে?

এসব কাজে বিঘ্নি পড়লে রক্ষে আছে?—একথার আলোচনায় খুব সরগরম হয় বাড়ি। শোকের কোনো ব্যাপার থাকে না। বাড়ির উনুনই জ্বলবে না। রাস্তার দোকান থেকে চা আসতে থাকে। অবশেষে রাত একটার পর বুড়ো কত্তা বোম্বাই খাটে শুয়ে নাচতে নাচতে চলে যান। পেশাদারি দক্ষ শববাহকরা আধা দৌড় দেয়। ফলে কীর্তন দলও দৌড়তে বাধ্য হয়। বড়ো পিসিমা বলেন, বাসিনী, সব্বস্ব রান্না পথে ঢেলে দিগে যা। ঘরদোর মুক্ত কর সব। বউরা যাও না। দাঁড়িয়ে বা রইলে কেন?

উচ্ছবের মাথার মধ্যে যে মেঘ চলছিল তা সরে যায়। সে বুঝতে পারে সব ভাত ওরা পথে ফেলে দিতে যাচ্ছে।

বাসিনী বলে, ধর দেখি দাদা।

—এই যে ধরি!

উচ্ছবের মাথায় এখন বুদ্ধি স্থির, সে জানে সে কী করবে।

—আমাকে দে ভারিটা।

মোটা চালের ভাতের বড়ো ডেকচি নিয়ে সে বলে, দূরে ফেলে দে আসি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ লয়তো কুকুরে ছেটাবে, সকালে কাকে ঠোক দেবে—বামুন বলে।

বেরিয়ে এসে উচ্ছব হনহনিয়ে হাঁটতে থাকে। খানিক হেঁটে সে আধা দৌড় মারে। ভাত, বাদার ভাত তার হাতে এখন। পথে ঢেলে দেবে? কাক-কুকুরে খাবে?

—দাদা।—ত্রস্ত বাসিনী প্রায় ছুটে আসে, অশুচ বাড়ির ভাত খেতে নি দাদা।

—খেতে নি? তুমিও ঝেয়ে বামুন হয়েছ?

—অ দাদা ব্যাগ্যতা করি—

উচ্ছব ফিরে দাঁড়ায়। তার চোখ এখন বাদার কামটের মতো হিংস্র। দাঁতগুলো বের করে সে কামটের মতোই হিংস্র ভঙ্গি করে। বাসিনী থমকে দাঁড়ায়।

উচ্ছব দৌড়তে থাকে। প্রায় এক নিশ্বাসে সে স্টেশনে চলে যায়। বসে ও খাবল খাবল ভাত খায়। ভাতে হাত ঢুকিয়ে দিতে সে স্বর্গ সুখ পায় ভাতের স্পর্শে। চন্নুনীর মা কখনো তাকে এমন সুখ দিতে পারেনি। খেতে খেতে তার যে কী হয়। মুখ ডুবিয়ে দিয়ে খায়। ভাত, শুধু ভাত। বাদার ভাত। বাদার ভাত খেলে তবে তো সে আসল বাদাটার খোঁজ পেয়ে যাবে একদিন। আছে, আরেকটা বাদা আছে। সে বাদাটার খোঁজ নির্ঘাত পাবে উচ্ছব। আরো ভাত খেয়ে নি। চন্নুনী রে! তুইও খা, চন্নুনীর মা খাও, ছোটো খোকা খা, আমার মধ্যে বসে তোরাও খা! আঃ! এবার জল খাই, জল! তারপর আরো ভাত। ভোরের টেনে চেইপে বসে সোজা ক্যানিং যাচ্চি। ভাত পেটে পড়েছে এখন ঝানচি ঝে ক্যানিং হয়ে দেশঘরে যেতে হবে।

উচ্ছব হাঁড়িটি জাপটে কানায় মাথা ছুঁইয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

পেতলের ডেকচি চুরি করার অপরাধে সকালে লোকজন উচ্ছবকে সেখানেই ধরে ফেলে। পেটে ভাতের ভার নিয়ে উচ্ছব ঘুমিয়েছিল, ঘুম তার ভাঙেনি।

মারতে মারতে উচ্ছবকে ওরা থানায় নিয়ে যায়। আসল বাদাটার খোঁজ করা হয় না আর উচ্ছবের। সে বাদাটা বড়ো বাড়িতে থেকে যায় অচল হয়ে।

ভারতবর্ষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

পিচের সড়ক বাঁক নিয়েছে যেখানে, সেখানেই গড়ে উঠেছে একটা ছোট্টো বাজার। পিছনে গ্রাম, ঘন বাঁশবনে ঢাকা। গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, তাই মাঝে-মাঝে বিমর্ষ সভ্যতার মুখ চোখে পড়ে—যখন কিনা কাঁচা রাস্তা ধরে সবুজ ঝোপের ফাঁকে এগিয়ে আসে কোনো যুবক বা যুবতী; পরনে যা পোশাক, তা আমেদাবাদের কারখানায় তৈরি। কিন্তু বাজারে বিদ্যুৎ আছে। তিনটে চায়ের দোকান, দুটো সন্দেশের, তিনটে পোশাকের, একটা মনোহারির, দুটো মুদিখানার। আর একটা আড়ত আছে। একটা হাস্কিং মেশিন আছে। তার পিছনে ইটভাটা আছে। চারপাশের গ্রাম থেকে লোকেরা আসে। রাত নটা অবধি জোর জমাটিভাব থাকে। তারপর সব ফাঁকা। শুধু কিছু আলো জ্বলে। কিছু নেড়িকুত্তার ছায়া ঘোরে পিচের ওপর। মাঝে-মাঝে চলে যায় ট্রাক দূরের শহরের দিকে। আবার সব চুপচাপ। বাঁকের মুখে আদ্যিকালের বটগাছে পেঁচার ডাকও স্তব্ধতার অন্তর্গত মনে হয়।

সময়টা ছিল শীতের। বাজারের উত্তরে বিশাল মাঠ থেকে কনকনে বাতাস বয়ে আসছিল সারাক্ষণ। তারপর আকাশ ধূসর হলো মেঘে। হালকা বৃষ্টি শুরু হলো। রাঢ়বাংলার শীতে এমনিতেই খুব জাঁকালো। বৃষ্টিতে তা হলো ধারালো। ভদ্রলোকে বলে 'পউষে বাদলা'। ছোটোলোকে বলে 'ডাওর'। আর বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস জোরালো হলে তারা বলে 'ফাঁপি'। সেবার এই আবহাওয়া হয়ে পড়ল 'ফাঁপি'। তখনও দূরের মাঠে ধান কাটা

হয়নি। এই অকাল-দুর্যোগে ধানের ক্ষতি হবে প্রচণ্ড। তাই লোকের মেজাজ গেল বিগড়ে। চাষাভুষো মানুষ চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে-দিতে প্রতীক্ষা করতে থাকল রোদে ঝলমল একটা দিন এবং মুণ্ডুপাত করতে থাকল আল্লা-ভগবানের। শেষ অবধি ক্ষিপ্ত কোনো-কোনো যুবক চাষি চেঁচিয়ে বলে দিল—মাথার ওপর আর কোনো শালা নেই রে—কেউ নাই।

কেউ নেই মাথার ওপর, তখন যা খুশি করা যায়। ক্ষিপ্ত মেজাজে কথায় কথায় তর্ক বাধে। মারামারির উপক্রম হয়। এবং তর্কের কোনো প্রসঙ্গ-অপ্রসঙ্গ নেই—একটা কিছু পেলেই হলো। সেই দুরন্ত শীতের অকাল-দুর্যোগে গ্রামের ঘরে বসে কারো সময় কাটে না। সবাই চলে আসে সভ্যতার ছোট্ট উনোনের পাশে হাত-পা সেঁকে নিতে। এইটুকুই যা সুখ তখন। এবং অলস দিনকাটানোর একঘেয়েমি দূর করতেই নানান কথা আসে। বোমবাইয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রী কিংবা গায়ক, অথবা ইন্দিরা গান্ধী, মুখ্যমন্ত্রী, এম.এল.এ.—নয়তো সরা বাউরি সে-সবই এসে পড়ে। জোর কথা কাটাকাটি হয় চাওলার বিক্রিবাটা বাড়ে। ধানের মরশুম—আজ না-হোক, কাল পয়সা পাবেই, তাই ধারের অঙ্ক বেড়ে চলে।

সেই সময় এল এক বুড়ি। থুত্থুড়ে কুঁজো ভিখিরি বুড়ি। রাক্ষুসী চেহারা। একমাথা সাদা চুল। ছেঁড়া নোংরা একটা কাপড় পরনে, গায়ে জড়ানো তেমনি চিটচিটে তুলোর কম্বল, এক হাতে বেঁটে লাঠি। পিচের পথে ভিজতে-ভিজতে দিব্যি একই তালে হেঁটে এল। ক্ষয়া খর্বুটে মুখে তার সুদীর্ঘ আয়ুর চিহ্ন প্রকট। তর্কের মধ্যে চায়ের দোকানে ঢুকে চা চাইল সে। তাকে দেখে সবাই তর্ক থামাল। এই দুর্যোগে কীভাবে বেঁচেবর্তে হেঁটে আসতে পারল, সেটাই সবাইকে অবাক করেছিল।

চা খুব আরামে গিলে বুড়ি সবার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না। তখন একজন তাকে জিজ্ঞেস করল—ও বুড়ি, তুমি এলে কোত্থেকে?

বুড়ি বড়ো মেজাজি। গজগজ করে জবাব দিল—সে-কথায় তোমাদের কাজ কী বাছারা?

ওরা হেসে উঠল—। ওরে বাবা! ভারি তেজি দেখছি! এই বাদলায় তেজি টাট্টুর মতন বেরিয়ে পড়েছে।

বুড়ি খেপে গেল।—তোমাদের কত্তাবাবা টাট্টু! খবর্দার, অকথাকুকথা বোলো না। আমি যেখান থেকেই আসি, লোকের কী?

একজন ঠান্ডা মাথায় বলল—ও বুড়ি, তুমি থাকো কোথায়, তাই জিজ্ঞেস করছে এরা।

—তোমাদের মাথায়।

বলেই সে কম্বলের ভেতর থেকে একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা পয়সা খুলতে থাকল। তারপর চায়ের দাম মিটিয়ে আবার রাস্তায় নামল।

লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল—মরবে রে, নির্ঘাত মরবে বুড়িটা!

বুড়ি ঘুরে বলল—তোরা মর্, তোদের শতগুষ্টি মরুক।

সবাই দেখল বুড়ি নড়বড় করে বাঁকের মুখের বটতলায় গেল। বটতলাটা ফাঁকা। মাটি ভিজে প্রায় কাদা হয়ে রয়েছে। সে সবার অবাক চোখের সামনে সেখানে গিয়ে গুঁড়ির কাছে একটা মোটা শেকড়ে বসে পড়ল। শেকড়টার পিছনে গুঁড়ির গায়ে খোঁদল আছে। সেখানে পিঠ ঠেকিয়ে পা ছড়াল সে। বোঝা গেল, বুড়ির এ অভিজ্ঞতা প্রচুর আছে। অর্থাৎ সে বৃক্ষবাসিনী।

কেউ কেউ বলল—বরং বারোয়ারিতলায় গেলেই পারত। নির্ঘাত মরে যাবে। এ-কথার পর স্বভাবত এবার বুড়িকে নিয়ে অনেক কথা এসে পড়ল। আবার জমে গেল।...

পউষে বাদলা সম্পর্কে গ্রামের 'ডাকপুরুষের' পুরোনো 'বচন' আছে। তা হল: শনিতে সাত, মঙ্গলে পাঁচ, বুধে তিন—বাকি সব দিন-দিন। অর্থাৎ শনিতে বাদলা লাগলে সাতদিন থাকবে, মঙ্গলে পাঁচদিন, বুধে তিনদিন।

অন্যদিনে লাগলে একদিনের ব্যাপার। এ বাদলা লেগেছিল মঙ্গলে। কেউ অবশ্য হিসেব করেনি—কিন্তু যেদিন ছাড়ল, সেদিন আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল একেবারে। সূর্যের উজ্জ্বল মুখ দেখা গেল। আর, সবাই আবিষ্কার করল বটতলায় সেই গুঁড়ির খোঁদলে পিঠ রেখে বুড়ি চিত হয়ে পড়ে আছে—নিঃসাড়।

অনেকটা বেলা হলেও সে নড়ছে না দেখে চাওলা জগা বলল—নির্ঘাত মরে গেছে বুড়িটা।

একজন বলল—সর্বনাশ! তাহলে শ্যালকুকুরে ছিঁড়ে খাবে যে! গন্ধে টেঁকা যাবে!

একজন দুজন করে ভিড় বাড়তে থাকল। কেউ কেউ বুড়ির কপাল ছুঁয়ে দেখল—প্রচণ্ড ঠান্ডা। একজন নাড়িও দেখল—কোনো স্পন্দন নেই। অতএব মড়াই বটে।

চৌকিদারকে খবর দেওয়া হল। সে এসে বলল—থানায় খবর দিয়ে কী হবে? ফাঁপিতে এক ভিখিরি পটল তুলেছে, তার আবার থানা-পুলিশ! পাঁচ কোশ দূরে থানায় খবর দাও, তারপর ওনার আসতে আসতে রাত-দুপুর। ততক্ষণে গন্ধ ছুটবে। কবে মরেছে হিসেব আছে নাকি? দেখছ না, ফুলে ঢোল হয়েছে কেমন।

—তাহলে কী করব চৌকিদারদা?

—লদীতে ফেলে দিয়ে এসো! ঠিক গতি হয়ে যাবে—যা হবার!

বিজ্ঞ চৌকিদারের পরামর্শ মানা হলো। মাঠ পেরিয়ে দু-মাইল দূরে নদী। এখন শুকনো। সেখানে চড়ায় ফেলে দিয়ে এল কজন মিলে। বাঁশের চ্যাংদোলায় ঝোলানো হয়েছিল। সেটাও ফেলে দিয়ে এল ওরা। বুড়ির শরীর উজ্জ্বল রোদে তপ্ত বালিতে চিত হয়ে পড়ে রইল।

ফিরে এসে সবাই দিগন্তে চোখ রাখল ঝাঁকে ঝাঁকে কখন শকুন নামবে।

হঠাৎ বিকেলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। মাঠ পেরিয়ে একটা চ্যাংদোলা আসছে। সেটা যখন বাজারে পৌঁছোল তখন জানা গেল ব্যাপারটা। সেই বুড়ির মড়াটাই তুলে নিয়ে আসছে মুসলমানপাড়ার লোকেরা। আরবি মন্ত্র পড়ছে ওরা। মাথায় টুপিও পরেছে কেউ কেউ।

যারা ফেলে দিয়ে এসেছিল, তারা হিন্দু। তারা অবাক হয়ে এবং রেগে গিয়ে জানতে চাইল—কী ব্যাপার?

না—বুড়ি যে মুসলমান।

প্রমাণ?

প্রমাণ অনেক। অনেকে তাকে শুনেছে বিড়বিড় করে আল্লা বা বিসমিল্লা বলতে। এমনকী গাঁয়ের মোল্লাসায়েব অকাট্য শপথ করে বললেন—আজ ফজরে (ভোরের নমাজের সময়) যখন নমাজ সেরে এদিকে বাস ধরতে আসছি, তখনই বুড়ি মারা যাচ্ছিল। ওকে স্পষ্ট কলমা পড়তে শুনলাম। তা—কে জানে, বুড়ি মরছে? আমি যাচ্ছি শহরে—মামলার দিন। তাই দেখা হল না ব্যাপারটা। ফিরে এসে শুনি ওকে নদীতে ফেলে দিয়েছে। তৌবা! তৌবা! তা কি হয় আমরা বেঁচে থাকতে? তাই কবরে দেবার ব্যবস্থা করলাম।

গাঁয়ের ভটচাজমশাই সবে বাস থেকে নেমেছেন। উঁকি মেরে সব দেখে-শুনে বললেন—অসম্ভব। আমিও তো মোল্লার সঙ্গে একই বাসে আজ শহরে গিয়েছিলুম। আমি স্পষ্ট শুনেছি, বুড়ি বলছিল শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি।

তাঁর সপক্ষে অনেক প্রমাণ জুটে গেল। নকড়ি নাপিত দিব্যি করে বলল—কাল আমি কামাতে বসব বলে বটতলায় এসেছিলাম। দেখলাম বসা যাবে না। তখন বুড়িকে স্পষ্ট বলতে শুনেছি আপন মনে বলছে—হরিবোল, হরিবোল!

—ভুল শুনেছ। ফজলু সেখ বলল।—আমি স্বকর্ণে শুনেছি, বুড়ি লাইলাহা ইল্লাল্ল বলছে!

নিবারণ বাগদি রাগী লোক। একসময় দাগি ডাকাত ছিল। চেঁচিয়ে উঠল—মিথ্যে!

করিম ফরাজি এখন খুব নমাজ পড়ে এবং 'বান্দা' মানুষ। একদা সে ছিল পেশাদার লাঠিয়াল। নিবারণের চ্যাঁচানি বরদাস্ত করবে কেন সে? আরো চেঁচিয়ে বলল—খবরদার!

বচসা বেড়ে গেল। তর্কাতর্কি উত্তেজনা হল্লা চলতে থাকল। তারপর দেখা গেল একদল লোক সেই বাঁশের চ্যাংদোলাটা নিয়ে টানাটানি শুরু করেছে। দেখতে-দেখতে প্রচণ্ড উত্তেজনা ছড়াল চারদিকে। দোকানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ হতে থাকল। আর তারপরই দেখা গেল গ্রাম থেকে অনেক লোক দৌড়ে আসছে। সবার হাতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র।

চ্যাংদোলাটা তখন পিচের ওপর। বুড়ির মড়ার দু-পাশে স্পষ্ট দুটো জনতা দাঁড়িয়ে গেছে। দু-দলের হাতেই অস্ত্রশস্ত্র। পরস্পরকে লক্ষ করে গালাগালি চলছে। মাঝে-মাঝে মোল্লাসায়েব চেঁচিয়ে উঠছেন—মোছলেম ভাইসকল! জেহাদ, জেহাদ। নাকায়েতকবির—আল্লাহু আকবর!

অন্যদিকে ভটচাজমশাই গর্জে বললেন—জয় মা কালী! যবন নিধনে অবতীর্ণ হও মা। জয় মা কালী কি জয়!

ধুন্ধুমার গর্জন প্রতিগর্জন এবং দেখা গেল, বিপন্ন আইনরক্ষক বেচারা নীল উর্দিপরা চৌকিদার তার লাঠিটি উঁচিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং দু-পক্ষকেই কিছু বলার চেষ্টা করছে। যখনই মুসলিমপক্ষ এক-পা এগিয়ে আসে সে মরিয়া হয়ে লাঠিটা পিচে ঠুকে গর্জায়—সাবধান। আবার হিন্দুপক্ষ এগোলে সে একইভাবে সেদিকে লাঠি ঠুকে চেঁচায়—খবরদার!

কতক্ষণ সে এই মারমুখী জনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত কে জানে—সে এবার পর্যায়ক্রমে পাগলের মতন দুদিকে একবার করে পিচে লাঠি ঠুকতে শুরু করল। খট্ খট্ খট্ খট্ শব্দে কাঁপতে থাকল।

তারপরই দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। বুড়ির মড়াটা নড়ছে। নড়তে-নড়তে উঠে বসার চেষ্টা করছে। দু-দিকের সশস্ত্র জনতা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। চৌকিদার হাঁ করে দেখছে।

তারপর বুড়ি উঠল। উঠে দু-দিকে তাকাল—ভিড় দুটোকে, দেখল। মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। সেই বিকৃত মুখে ফ্যাক-ফ্যাক করে হেসে উঠল সে।

চৌকিদার এতক্ষণে মুখ খুলে বলল—বুড়িমা! তুমি মরনি!

—মর্, তুই মর্। তোর শতগুষ্টি মরুক!

দু-দিকের ভিড়ও চেঁচিয়ে উঠল—বুড়ি! তুমি মরনি!

—তোরা মর্। তোরা মর্ মুখপোড়ারা!

—বুড়ি, তুমি হিন্দু না মুসলমান?

বুড়ি খেপে গিয়ে বলল—চোখের মাথা খেয়েছিস মিনসেরা? দেখতে পাচ্ছিস নে? ওরে নরকখেকোরা, ওরে শকুনচোখোরা। আমি কী তা দেখতে পাচ্ছিস নে? চোখ গেলে দেবো—যা, যা, পালাঃ।

বলে সে নড়বড় করে রাস্তা ধরে চলতে থাকল। ভিড় সরে তাকে পথ দিল। শেষ রোদের আলোয় সে দূরের দিকে ক্রমশ আবছা হয়ে গেল।

কবিতা

রূপনারানের কূলে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

শিকার

জীবনানন্দ দাশ

ভোর;
আকাশের রং ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল :
চারি দিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ।
একটি তারা এখন আকাশে রয়েছে :
পাড়াগাঁর বাসরঘরে সব চেয়ে গোধূলিমদির মেয়েটির মতো;
কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে মুক্তা
                    আমার নীল মদের গেলাসে রেখেছিল
হাজার হাজার বছর আগে এক রাতে তেমনি—
তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনও।

হিমের রাতে শরীর 'উম্' রাখবার জন্য দেশোয়ালিরা
                    সারারাত মাঠে আগুন জ্বেলেছে—
মোরগফুলের মতো লাল আগুন;
শুকনো অশ্বত্থপাতা দুমড়ে এখনও আগুন জ্বলছে তাদের;

সূর্যের আলোয় তার রং কুঙ্কুমের মতো নেই আর;
হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।
সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চারি দিকের বন ও আকাশ
ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।

ভোর;
সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে!
সুন্দর বাদামি হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল!
এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে;
কচি বাতাবিলেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে;
নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নামল—
ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মতো একটা আবেগ দেওয়ার জন্য;
অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো
একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য;
এই নীল আকাশের নীচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।

একটা অদ্ভুত শব্দ।
নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল।
আগুন জ্বলল আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এল।
নক্ষত্রের নীচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরানো শিশিরভেজা গল্প;
সিগারেটের ধোঁয়া;
টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

মহুয়ার দেশ

সমর সেন

১

মাঝে মাঝে সন্ধ্যার জলস্রোতে
অলস সূর্য দেয় এঁকে
গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ,
আর আগুন লাগে জলের অন্ধকারে ধূসর ফেনায়।
সেই উজ্জ্বল স্তব্ধতায়
ধোঁয়ার বঙ্কিম নিঃশ্বাস ঘুরে ফিরে ঘরে আসে
শীতের দুঃস্বপ্নের মতো।
অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে

দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,

আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস

রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।

আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।

২

এখানে অসহ্য, নিবিড় অন্ধকারে

মাঝে মাঝে শুনি

মহুয়া বনের ধারে কয়লার খনির
গভীর, বিশাল শব্দ,

আর শিশিরে-ভেজা সবুজ সকালে

অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক,

ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়
কীসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন।

আমি দেখি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

গাছগুলো তুলে আনো, বাগানে বসাও
আমার দরকার শুধু গাছ দেখা
গাছ দেখে যাওয়া
গাছের সবুজটুকু শরীরে দরকার
আরোগ্যের জন্যে ওই সবুজের ভীষণ দরকার

বহুদিন জঙ্গলে কাটেনি দিন
বহুদিন জঙ্গলে যাইনি
বহুদিন শহরেই আছি
শহরের অসুখ হাঁ করে কেবল সবুজ খায়
সবুজের অনটন ঘটে...

তাই বলি, গাছ তুলে আনো
বাগানে বসাও আমি দেখি
চোখ তো সবুজ চায়!
দেহ চায় সবুজ বাগান
গাছ আনো, বাগানে বসাও।
আমি দেখি।।

ক্রন্দনরতা জননীর পাশে

মৃদুল দাশগুপ্ত

ক্রন্দনরতা জননীর পাশে
এখন যদি না-থাকি
কেন তবে লেখা, কেন গান গাওয়া
কেন তবে আঁকাআঁকি?

নিহত ভাইয়ের শবদেহ দেখে
না-ই যদি হয় ক্রোধ
কেন ভালোবাসা, কেন-বা সমাজ
কীসের মূল্যবোধ!

যে-মেয়ে নিখোঁজ, ছিন্নভিন্ন
জঙ্গলে তাকে পেয়ে
আমি কি তাকাব আকাশের দিকে
বিধির বিচার চেয়ে?

আমি তা পারি না। যা পারি কেবল
সে-ই কবিতায় জাগে
আমার বিবেক, আমার বারুদ
বিস্ফোরণের আগে।

নাটক

বিভাব

শম্ভু মিত্র

সূচনা

এই একাঙ্কিকাটিতে চরিত্ররা তাদের বাস্তব জীবনের পরিচিতি নিয়েই উপস্থিত হন। শম্ভু মিত্র— শম্ভু। অমর গাঙ্গুলি অমর। ইনি বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠীর জন্মলগ্ন থেকে এই দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর বৌদী—তৃপ্তি মিত্র। বহুরূপীর সমস্ত সভ্য-স্বজন-পরিজন তাঁকে ওই নামেই ডাকতেন।

নাটকটির শুরু দর্শকের সঙ্গে শম্ভু মিত্র-র একটি লম্বা কথোপকথন দিয়ে। পরদা খুললে দেখা যায় মঞ্চ সম্পূর্ণ ফাঁকা। সাদা-সিধে সাদা আলোয় মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শম্ভু মিত্র। তিনি সরাসরি দর্শককে বলতে শুরু করেন—

কোনো এক ভদ্রলোক পুরোনো সব নাট্যশাস্ত্র তল্লাশ করে আমাদের এই নাটকের নাম দিয়েছেন 'বিভাব' নাটক। সংস্কৃত হিসাবে তিনি ঠিক কী বেঠিক সে বিবেচনা করবেন সংস্কৃত পণ্ডিতেরা, কিন্তু নামের দিক থেকে আমাদের একটা সামান্য আপত্তি আছে। আমাদের মনে হয় এর নাম হওয়া উচিত 'অভাব নাটক'। কারণ দুরন্ত অভাব থেকেই এর জন্ম। আমাদের একটা ভালো স্টেজ নেই। সিনসিনারি, আলো, ঝালর কিছুই আমাদের

নিজেদের নেই। সঙ্গে থাকবার মধ্যে আছে কেবল নাটক করবার বোকামিটা। তাও যদি বা জোগাড়যন্তর করে অভিনয় একটা ফাঁদি সঙ্গে সঙ্গে দেখি সরকারের পেয়াদা খাজনার খাতা খুলে স্টেজের দরজায় হাজির। তাঁরা পেশাদারের কাছে খাজনা নেন না। কিন্তু আমাদের কাছে নেন। কারণ, আমরা তো নাটক নিয়ে ব্যবসা করি না, তাই সরকার আমাদের গলা টিপে খাজনা আদায় করে নেন। এবং সেই নেওয়াটা এমন বিচিত্র সাঁড়াশি ভঙ্গিতে যে, আমরা সর্বস্ব দিয়ে থুয়ে আবার 'ব্যোমকালী' বলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। তাই অনেক ভেবেচিন্তে আমরা একটা প্যাঁচ বের করেছি। যাতে স্টেজের দরকার হবে না–যে-কোনো রকম একটা প্ল্যাটফর্ম হলেই চলবে, সিনসিনারি, দরজা-জানালা, টেবিল-বেঞ্চি কিছুরই দরকার হবে না। এমনকি বাংলা সরকারও না।

বুদ্ধিটা কী করে এল তা বলি। এক পুরোনো বাংলা নাটকে দেখি লেখা আছে 'রাজা রথারোহণম নাটয়তি।' অর্থাৎ, 'রাজা রথে আরোহণ করার ভঙ্গি করলেন'। কিন্তু কী যে সেই ভঙ্গি, তা আজ কেউ বলতে পারে না। নিশ্চয়ই এমন কোনো ভঙ্গি ছিল, যা করলে দর্শক ধরে নিত যে রাজা রথে চড়লেন। রথেরও দরকার হত না, ঘোড়ারও দরকার হত না। –কিন্তু কী সেই ভঙ্গি যা আজকের দর্শক মেনে নেবে?

উড়ে দেশের যাত্রায় দেখেছি রাজা বললেন দূতকে–তমে ঘোড়া নেইকরি চঞ্চল খবর নেই আসিবি।

দূত অমনি ছোটো ছেলের মতো দুই পায়ের ফাঁকে একটা লাঠি গলিয়ে ঘোড়ায় চড়ার মতো হেট্ হেট্ করতে করতে বেরিয়ে গেল এবং একটু পরে সেই একই ভঙ্গিতে ফিরে এসে সংবাদ রিপোর্ট করে দিল। দর্শক কিন্তু কেউ হাসল না, সবাই অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে মেনে নিল যে দূত ঘোড়ায় চড়েই গেল এবং এল।

আর একবার এক মারাঠি তামাশায় দেখেছিলাম, মঞ্চের একপাশে দাঁড়িয়ে চাষি তার জমিদারের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করল, শেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলল মন্দিরে, ভগবানের কাছে নালিশ জানাতে। চলল বটে, কিন্তু বেরিয়ে গেল না। তক্তার উপরে বারকয়েক গোল হয়ে ঘুরপাক খেলে, যেন গ্রামটা অতিক্রম করে যাচ্ছে, তারপর অপর একপাশে গিয়ে কাল্পনিক মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ভগবানকে মনের দুঃখের কথা নিবেদন করতে থাকল। এদিকে যে অভিনেতা জমিদার সেজে এতক্ষণ গর্জন করছিল, সে দর্শকের সামনেই মুখে একটা দাঁড়ি গোঁফ এঁটে পুরুত সেজে অপর পাশে চাষির সামনে গিয়ে আবার ধর্মীয় তর্জন শুরু করে দিল, এবং মাঠ ভর্তি লোক নিঃশব্দে এসব মেনে নিয়ে দেখলে।

দেখে প্রথমে খুব উল্লাস হয়েছিল যে পেয়ে গেছি পন্থা, কিন্তু যতই ভাবতে থাকলাম ততই যেন আবার কেমন চুপসে গেলাম। মনে হল লোকে মানবে না। এ শহরে সব কত কত ইংরিজি জানা লোক, তারা ফি হপ্তায় বিলিতি বায়োস্কোপ দেখে, আর প্যান্টুলুন পরে ইংরিজি বলে। তারা এসব মানবে কেন? তবে হ্যাঁ, মানতে পারে, যদি সাহেবে মানে। যেমন রবিঠাকুরকে মেনেছিল।

এমনি সময় হঠাৎই এক সাহেবের লেখা পড়লাম। রুশদেশীয় এক বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক—নাম আইজেনস্টাইন। একবার কাবুকি থিয়েটার বলে এক জাপানি থিয়েটার মস্কোতে গিয়েছিল। তাদের অভিনয় দেখে আইজেনস্টাইন সাহেব অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে অনেক কথা লিখেছেন। তাঁর লেখা পড়ে জানতে পারলাম

যে সে অভিনয়েও ভঙ্গির বহুল ব্যবহার আছে। যেমন ধরুন কোনো এক 'নাইট' অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে এক দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন—মনে করুন তিনি এই স্টেজের পিছনদিক থেকে গম্ভীরভাবে এগোতে থাকলেন এবং তার ঠিক পিছনেই দুজন লোক একটা মস্ত দুর্গদ্বার হাতে করে দাঁড়িয়ে রইল। তারা শিফটার। স্টেজ-এর উপর তাদের উপস্থিতিতে কেউ কিছু মনে করেন না। নাইট ২-৩ পা এগোল আর সেই শিফটাররা বড়ো দরজা রেখে দিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত ছোটো দরজা ধরে দাঁড়াল—এ রকম করে 'নাইট' যখন প্রায় ফুটলাইটের কাছে এসে পড়েছেন তখন দেখা যায় শিফটাররা এই এতটুকু একটা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ Perspective রচনা হল আর কী। 'নাইট' কত দূর এসে পড়েছেন তাই বোঝানো হল। তারপর ধরুন দুজন লোকের লড়াইয়ের একটা দৃশ্য আছে—সে লড়াই সত্যিকার তলোয়ার দিয়ে ঝনঝন করে বাস্তব লড়াই নয়। কাল্পনিক খাপ থেকে কাল্পনিক তলোয়ার বের করে ভীষণভাবে কাল্পনিক যুদ্ধ করতে করতে একজন পেটে কাল্পনিক খোঁচা খেয়ে কাল্পনিকভাবে মরে গেল। সে মরারও বাহার কত। অর্থাৎ, আলতা চিপে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বীভৎস খিঁচুনি দেখিয়ে বাস্তব মরা নয়, সে খুব আর্টিস্টিক মরা, একেবারে ইসথেটিক মরা। ধরুন—একবার হয়তো হাতটা নড়ে উঠল—তারপর একটা ঠ্যাং তিরতির করে কাঁপল—তারপর মুণ্ডুটা দুবার নড়ল, চোখটা দুবার ঘুরল। ব্যাস—তারপর জিভ বের করে এন্তেকাল ফরমালো। এবং সেই সময়ে যখন তার সদ্য বিধবা স্ত্রী ছুটে এসে রৈ-রাই করে কাঁদছে তখন যদি সেই মৃত লোকটা উঠে পুটপুট করে চলেই যায়—তো দর্শকেরা কিছু মনে করে না। কারণ স্ত্রীর দুঃখটাই প্রধান সেখানে। স্বামীটা তো অবান্তর।

এই পড়ে বুকে ভরসা এল—কারণ সাহেবে একে সার্টিফিকেট দিয়েছে। এবারে নিশ্চয়ই আমাদের দেশের ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা এর কদর বুঝবেন। আর তো কিছুই না, খালি মেনে নেওয়া। ধরে নিন আপনারা যদি মনে করতেন যে এটা একটা গভীর বন এবং আমি একটা হনুমান, তাহলে আমি হাজার আপত্তি করলেও কি চলত? সকলে মিলে আমার মুখ পুড়িয়ে প্রমাণ করে ছাড়তেন যে আমি তাই।—তাহলে সেই মনে করাটাই আর একটু বেশি করে করুন না, সব ঝঞ্ঝাট মিটে যায়।

যেমন মনে করুন, আমি কারোর বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ছি আর ডাকছি—

শম্ভু। অমর—অমর আছ নাকি?

অমর স্টেজে আসে।

অমর। কে? (শম্ভুদার মুখোমুখি দাঁড়ায় কিন্তু দোতলা থেকে নীচে তাকানোর ভঙ্গি করে তাকিয়ে বলে) আরে শম্ভুদা—কী ব্যাপার, নীচে দাঁড়িয়ে কেন? চলে আসুন।

শম্ভু। (অমরের সামনেই দাঁড়িয়ে কিন্তু বলেন ওপরের দিকে তাকিয়ে) কী করে যাব? দরজা বন্ধ যে!

অমর। ঠেলুন—খুলে যাবে—সিঁড়ি দেখতে পাবেন—সোজা চলে আসুন।

শম্ভু। তাই নাকি? (দরজা ঠেলার ভঙ্গি করেন—সামনে যেন সিঁড়ি দেখতে পান, সিঁড়িতে ওঠবার ভঙ্গি করতে করতে) আমি তো বুঝতেই পারিনি।

অমর। কীভাবে বুঝবেন—এভাবে তো কোনোদিন আসেননি। (ততক্ষণে শম্ভু মিত্র ওপরে উঠে এসেছেন)—তারপর কী ব্যাপার? হঠাৎ এই সময়ে, মানে এরকম অসময়ে—

শম্ভু। এমনি এলাম—একেবারে এমনি নয়, বলতে পারো হাসাতে এলাম—বা হাসির খোরাক জোগাড় করতে এলাম। সম্পাদক বলেছে হাসির নাটক করতে হবে, তার নাকি দারুণ বক্স অফিস।

অমর। হাসাতে এলেন,—তা বেশ। চলুন বসবার ঘরে গিয়ে বেশ জমিয়ে বসি। আমরা বাঙালিরা শুনি কাঁদুনে জাত—

শম্ভু। হ্যাঁ বল্লভভাই বলে গেছেন—

অমর। সুতরাং হাসতে হলে বেশ কোমর বেঁধে হাসতে হবে। (কথা বলতে বলতেই তাঁরা একই জায়গায় দু'বার বৃত্তাকারে ঘুরে যেন অন্য ঘরে এলেন—এই ভঙ্গি করে অমর গাঙ্গুলি বললেন)—নিন, বসুন এই চেয়ারটাতে—আমি জানলাটা খুলে দিই, যা গরম!

অমর পিছনে গিয়ে কল্পিত জানলা খোলেন—

শম্ভু মিত্র অমর নির্দিষ্ট কল্পিত চেয়ারে বসার ভঙ্গি করে থাকেন।

শম্ভু। বাঃ বেশ বাতাস আসছে তো।

অমর। হ্যাঁ দক্ষিণমুখী জানলা যে। কী, বেশ আরাম করে বসেছেন তো?

অমরও এসে শম্ভু মিত্রের পাশে বসেন।

শম্ভু। কী হে, সিগারেট আছে নাকি?

অমর। হ্যাঁ নিশ্চয়ই—এখন আপনি যা চাইবেন তা-ই পাবেন আমার কাছে।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করার ভঙ্গি করেন।
প্যাকেট থেকে যেন একটা বার করে শম্ভু মিত্রকে দেন,
আর একটি নিজে মুখে নেন। অন্য পকেট থেকে দেশলাই
বার করে দু'জনার সিগারেট ধরান—এবং উভয়েই খুব
আরাম করে সিগারেট খাওয়ার ভঙ্গি করেন।

অমর। কী, চা খাবেন নাকি?

শম্ভু। হ্যাঁ খেতে পারি, যদি অসুবিধা না হয়।

অমর। আরে না। অসুবিধা আবার কী হবে। (বাঁদিকের উইংসের কাছে গিয়ে) বৌদি দুকাপ চা—

শম্ভু। যদি অসুবিধা হয় তা হলে—

নেপথ্য থেকে বৌদি তৃপ্তি বলেন, 'না না কোনো অসুবিধা হবে না।
আমি এক্ষুনি নিয়ে যাচ্ছি।'—অমর এসে আবার নিজের চেয়ারে

বসার ভঙ্গি করেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৌদি তথা তৃপ্তি মিত্র

দুহাতে করে কল্পিত চায়ের কাপ নিয়ে আসেন।

এঁরা দুজনে বৌদির হাত থেকে চায়ের কাপ নেন।

শম্ভু মিত্র নিজের হাতের কল্পিত সিগারেটের দিকে চেয়ে বলেন—

শম্ভু। এঃ। এতবড়ো সিগারেটটা নষ্ট হবে!

অমর। ঠিক আছে ফেলে দিন না—আবার দেবো—

শম্ভু। ওঃ দাতাকর্ণ যে।

অমর। এই কিছুক্ষণের জন্য।

শম্ভু মিত্র সিগারেট ফেলে দেন।

পায়ের উপর পা তুলে আরাম করে বসে চা খেতে থাকেন।

অমরকেও সেই রকমই আরাম পেতে দেখা যায়।

বৌদি দুজনার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন—

বৌদি। তা কী খবর?

শম্ভু। এই এলাম আর কী।

অমর। শুধু এলেন না—হাসাতে এলেন।

বৌদি। ওঃ—তা—কই?

অমর। হ্যাঁ—কই, হাসান!

শম্ভু। (নিজের কল্পিত বসবার ভঙ্গি নির্দেশ করে) কেন, হাসি পাচ্ছে না?

শম্ভু। হ্যাঁ বল্লভভাই বলে গেছেন—

অমর ও বৌদি। না।

শম্ভু। (কল্পিত চেয়ার থেকে টলতে টলতে দাঁড়িয়ে) সে কী! এত কষ্ট করছি তবু হাসি পাচ্ছে না!

অমর। আরে এতে হবে না শম্ভুদা—এতে হবে না।

অমরও দাঁড়িয়ে ওঠে—

বৌদি। এতে হবে না।

অমর। হ্যাঁ, এতে কোনো গল্প নেই, কোনও—যাকে বলে হিউম্যান ইন্টারেস্ট নেই, কোনো পপুলার অ্যাপিল নেই—খামোখা হাসি পেলেই হল?

শম্ভু। ওঃ হিউম্যান ইন্টারেস্ট, পপুলার অ্যাপিল কিছুই নেই, না? তা হলে! তা হলে কী করা যায়?

বৌদি। তা হলে—

অমর। তা হলে—

সকলেই গালে হাত দিয়ে চিন্তার ভঙ্গি করেন—একেকজন একেক রকম

বৌদি। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলব?

শম্ভু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়—

অমর। বলুন না, বলুন।

বৌদি। আচ্ছা, পপুলার করতে হবে, এই তো? তা পৃথিবীতে সবচেয়ে পপুলার সবচেয়ে ইন্টারেস্ট-এর জিনিস কী?

শম্ভু ও অমর। সবচেয়ে পপুলার?...লারে লাপ্পা—

বৌদি। না, না, তার চেয়েও পপুলার।

অমর। তার চেয়েও পপুলার? কী?

বৌদি। প্রেম। পৃথিবীতে সবচেয়ে পপুলার জিনিস হচ্ছে প্রেম।

শম্ভু। (সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে) নিশ্চয়ই, দেখছ না বার্থ রেট কী হাই!

বৌদি। বেশ, তা হলে সবচেয়ে পপুলার জিনিস যদি প্রেম হয়, তা হলে আমাদের কী করা উচিত?

শম্ভু। কী করা উচিত?

অমর। প্রেমে পড়া উচিত।

বৌদি। আহা, সে তো ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমাদের—আমাদের একটা লভ সিন করা উচিত।

শম্ভু। লভ সিন!

অমর। লভ সিনটা আবার কী?

বৌদি। আরে লভ সিন বোঝেন না—মানে প্রেমের অভিনয়—

অমর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি লভ সিন—লভ সিন। বায়োস্কোপে দেখেছি।

বৌদি। আচ্ছা তা হলে একটা লভ সিন করা যাক। কিন্তু তা হলে তো এই টেবিল-চেয়ারগুলো সরাতে হবে।

শম্ভু ও অমর। হ্যাঁ, হ্যাঁ,—এক্ষুনি সরিয়ে দিচ্ছি।

দুটো কল্পিত চেয়ার এবং একটা টেবিল ওরা দুজনে নিয়ে যেন রেখে

আসে একদিকে—রেখে হাত ঝেড়ে বৌদির কাছে এসে দাঁড়ায়।

বৌদি। আচ্ছা, লভ সিন করতে হলে প্রথমেই কী দরকার?

শম্ভু। কী? চাঁদ, আকাশ—

অমর। আর দক্ষিণের খোলা বাতাস—

বৌদি। আরে ওসব তো পরে—তারও আগে দরকার একজন নায়ক এবং নায়িকার।

শম্ভু। হ্যাঁ, সে তো বটেই—নইলে একা চাঁদ আর কী করবে?

অমর। হ্যাঁ, ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া?

বৌদি। আচ্ছা, তাহলে আমাদের দরকার একজন নায়ক এবং একজন নায়িকা।

শম্ভু। নায়িকার দরকার?

বলেই তাড়াতাড়ি দর্শকদের দিকে তাকিয়ে

নায়িকা খোঁজবার ভঙ্গি করেন—

বৌদি। (অমরের কাছে গিয়ে) নায়িকা তো আমিই হতে পারি।

শম্ভু। তুমি? তুমিই হবে!

অমর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শম্ভুদা বৌদিই হোন না—অনেকদিন থেকে আমাদের দলে রয়েছেন।

শম্ভু। আচ্ছা, তা হলে তুমিই হও।

বৌদি। আচ্ছা নায়িকা তাহলে আমিই হলুম। এখন নায়ক?

অমর নায়কের কথা শুনেই তাড়াতাড়ি একটু এগিয়ে

পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে একদিকে কায়দা

করে তাকিয়ে একটা পা নাড়তে থাকেন।

বৌদি একবার শম্ভু মিত্রের দিকে—একবার অমর গাঙ্গুলিকে

যেন পরখ করে দেখেন। তারপর সিদ্ধান্ত নেন।

বৌদি। (শম্ভু মিত্রকে) আচ্ছা নায়ক তুমিই হও।

শম্ভু। আমি!!!

অমর। (বৌদির কথা শুনে সে স্পষ্টত হতাশ। তারপর অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাবার জন্য হাসবার ভঙ্গি করে বলে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, শম্ভুদা আপনিই হোন। আপনিই হোন।

শম্ভু। আমিই হব! আমাকে অবশ্য মানায় ভালো—চেহারাটা তো—

অমর। সে অবশ্য আমাকে কি আর কম মানায়? তা যাকগে—আপনিই হোন।

বৌদি। এখন তাহলে তুমি নায়ক আর আমি নায়িকা। আর এই ঘরটা ধরো রাস্তা।

শম্ভু। রাস্তা, মানে public thoroughfare?

অমর। আরে বব্‌বা, ঘরটা রাস্তা!

বৌদি। হ্যাঁ, এইটা একটা রাস্তা। এখান থেকে নায়িকা কলেজ থেকে ফিরছে—আর নায়ক আসছে। রাস্তায় তাদের দুজনের ধাক্কাধাক্কি হবে।

শম্ভু। রাস্তায় ধাক্কাধাক্কি হবে?

অমর। আর তাতেই হবে পরিচয়?

বৌদি। হ্যাঁ, হ্যাঁ লভ সিনে তাই হয়। নাও নাও—আমি যাচ্ছি তুমি এসো।

দুজনেই একটু পেছিয়ে গিয়ে start নিতে যান,

শম্ভু মিত্র হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন—

শম্ভু। দাঁড়াও, দাঁড়াও—আমি তো নায়ক—তা এ নায়ক কে? মানে সে কোত্থেকে আসছে? অফিস? কলেজ থেকে?—না বলাও যায় না আজকাল, ইস্কুল থেকে?

বৌদি। নায়ক আসছে। এটাই হল বড়ো কথা। নায়ক—নায়ক।

শম্ভু। ও নায়ক,—নায়ক। তার আপিস নেই, কলেজ নেই, কিছু নেই?

অমর। খালি সে ধাক্কা দিয়ে বেড়ায়?

শম্ভু। বাঃ, বেশ তো। ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। (দু'হাত জোড় করে প্রণাম করে বলে) জয় নটনাথায়।

চলতে শুর করেন—ওদিক থেকে বৌদিও আসছিলেন—

মাঝপথে দুজনায় ধাক্কা লাগে। বৌদি এক পা পিছিয়ে যান—

বৌদি। কেয়া আপ দেখতে নেহি—চোখ খুলে চলতে জানেন না?

—আপনি—আপনি—

হঠাৎ শম্ভু মিত্রের গালে একটা চড় বসিয়ে দেন—

শম্ভু ও অমর। আরে আরে এ কী হচ্ছে? মারামারি কেন?

বৌদি। (গম্ভীরভাবে) লভ সিন লভ সিন।

শম্ভু। এ বড়ো জখমি লভ সিন! তা আমি কী করব?

বৌদি। আমতা আমতা করো—আমতা আমতা করো।

শম্ভু। ইয়ে দেখিয়ে বাত এইসি হুয়ি—মানে ব্যাপারটা হল—মানে আপনাকে দেখে আমি—মানে—

বৌদি চোখের কোণ দিয়ে সলজ্জ ভঙ্গিমায় শম্ভু মিত্রের দিকে
তাকিয়ে হঠাৎ বাঁদিকের উইংসের দিকে চলে গিয়ে নেপথ্যে
তাকিয়ে বলেন—প্লে ব্যাক।
নেপথ্য থেকে বেজে উঠল হারমোনিয়াম।
একটি মেয়ের কণ্ঠে শোনা যায় 'মালতী লতা দোলে' গানের লাইনটি।
(কিঞ্চিৎ ন্যাকামির ভঙ্গিতে গাওয়া)
বৌদি গানের কথার সঙ্গে ঠোঁট মেলাতে থাকেন;
এবং দুহাত দিয়ে ধরে থাকেন একটা কল্পিত গাছের ডাল।
শম্ভু মিত্র ও অমর গাঙ্গুলি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকায় তাঁদের
বোঝাবার জন্য বলেন: গাছের ডাল, গাছের ডাল।—আবার গান
আরম্ভ করেন। গানটি ফিল্মি কায়দায় গাওয়া হচ্ছিল।
শম্ভু মিত্র বলে ওঠেন—

শম্ভু। যাও যাও—এই কি রবীন্দ্রনাথের গান হচ্ছে নাকি? ওই 'দোলে',— 'দোলে', করে?

নেপথ্যে যিনি হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন তিনি বলেন—
'আরে সব সময়ে কি aesthetic দিক দেখলেই চলে?
Box office বলেও তো একটা কথা আছে?'

শম্ভু। আর বংশদণ্ড বলেও একটা কথা আছে। সেটা যখন মাথায় পড়বে বুঝবে তখন। আরে! এই কি রবীন্দ্রনাথের গান? বিশ্বভারতীই কি পারমিশন দেবে?

অমর। আর দিলেও সে অনেক টাকা। আর তাছাড়া ওসব বাদ দিয়েও—হাসি পাবে না এর থেকে।

শম্ভু। ঠিক—এতে লোক হাসবে না—আমার তো হাসি পাচ্ছে না।

বৌদি। তা হলে—

অমর। তা হলে—

সবাই আবার গম্ভীরভাবে ভাবতে শুরু করে
হঠাৎ বৌদি বলে ওঠেন—

বৌদি। আচ্ছা আমি আর একটা চেষ্টা করব?

শম্ভু। কী চেষ্টা?

অমর। হ্যাঁ, চেষ্টা শেষ পর্যন্ত করতে হবে।

বৌদি। ধরো, আমরা যদি আর একটা—আর একটা লভ সিন করি?

শম্ভু। আরে, এর মাথায় খালি লভ সিন ঘোরে রে?

অমর। যুগটা কী দেখুন!

বৌদি। না না এটা আগের মতো নয়—এটা অন্য রকমের লভ সিন; প্রগ্রেসিভ লভ সিন।

শম্ভু। প্রগ্রেসিভ লভ সিন কী রকম? প্রগ্রেস করতে করতে লভ?

অমর। নাকি লভ করতে করতে প্রগ্রেস?

শম্ভু। বাব্বা, সমস্ত লভই তো দেখি—বিয়ের দুবছরের মধ্যে গন্‌ফট্‌।

বৌদি। আহা দ্যাখোই না, তোমরা কিছুই না দেখে মন্তব্য করতে থাকো।

অমর। আচ্ছা, ঠিক আছে—দেখেই মন্তব্য করব, নিন আরম্ভ করুন।

শম্ভু। হ্যাঁ, আরম্ভ করো, দেখাই যাক।

বৌদি। বেশ তাহলে আরম্ভ করছি। নায়ক আছে, নায়িকা তো আছেই। এখন একজন পুলিশ দরকার যে—

অমর। পুলিশ—এই দেখো ফ্যাসাদ—এখানে পুলিশ কোথায় পাব!

বৌদি। কেন আপনিই হোন না, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনিই হোন।

অমর। (ঘাবড়ে গিয়ে) আমি পুলিশ মানে এই চেহারায়?

শম্ভু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ৩২ ইঞ্চি বুক হলেই পুলিশ হওয়া যায়।

অমর। আমার ৩৩ ইঞ্চি।

শম্ভু। ওঃ তা হলে তুমি তো একেবারে সার্জেন্ট হয়ে যাবে।

বৌদি। যাক তা হলে সব হয়ে গেল, এবারে আরম্ভ করা যাক।
(পিছনের দিকে তাকিয়ে) আচ্ছা এখানে তো একটা জানালা আছে?

অমর। হ্যাঁ, দক্ষিণমুখী।

বৌদি। আর তার নীচের দিয়েই তো একটা রাস্তা আছে?

অমর। হ্যাঁ, মণি সম্মাদার লেন।

বৌদি। আচ্ছা ঠিক আছে (অমরকে) আপনি শুনুন—ও যখন দৌড়ে পালাবে—আপনি তখন গিয়ে ওকে ধরবেন।

শম্ভু। কে—অমর? আমাকে ধরবে?

অমর। কেন, পারব না ভাবছেন? হাঃ, কত লোককে ধরে ফেললাম।

শম্ভু। আচ্ছা দেখাই যাক।

অমর পিছনে গিয়ে খৈনি খাবার ভঙ্গি করেন। বৌদি একবার ভেবে নিয়ে ছোটো ছোটো steps-এ দৌড়ে কল্পিত জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকান—হঠাৎ কী যেন দেখে ভয় পেয়ে শম্ভু মিত্রের কাছে দৌড়ে এসে বলেন—

বৌদি। ওগো, এক্ষুনি দেখলাম রাস্তার মোড়ে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চয় তোমাকে ধরতে আসছে—তুমি পালাও—পায়ে পড়ি তুমি পালাও।

শম্ভু। (একটু হেসে হাত দুটো বুকের ওপর রেখে একটা পা নাচাতে নাচাতে বলেন) কেন, আমাকে ধরবে কেন?

বৌদি। বাঃ! তোমাকে ধরবে না? তুমি যে underground political leader—তোমাকে ধরবে না তো কাকে ধরবে?

শম্ভু। (হঠাৎ যেন ভয় পায়) এই! আমি কেন political leader হতে যাব? এ সব যা তা কথা বোলো না।

অমর। (পিছন থেকে দৌড়ে এসে) আরে এসব কী কথা। এখনই কে সত্যি বলে মনে করবে—শেষে হাসতে গিয়ে কাঁদতে হবে।

শম্ভু। হ্যাঁ বহুরূপী তখন লাটে উঠবে। (দর্শকদের দিকে তাকিয়ে) না না মশায়—এসব সত্যি নয়, আপনারা বিশ্বাস করবেন না।

বৌদি। আরে মহা মুশকিল হল তো! তুমি যদি underground political leader না হও তা হলে গল্পের political significance আসে কোত্থেকে? গল্পটা progressive হয় কী করে?

শম্ভু। ও, গল্পটা progressive হবে না—না? তা হলে—তা হলে—

অমর। তা হলে হয়েই ফেলুন শম্ভুদা—

শম্ভু। দাঁড়াও, আমি চিন্তা করে দেখি— (সামনের কপালে চুল নামিয়ে চিন্তার ভঙ্গি করেন।)

বৌদি। না, না, আর চিন্তা নয়! ওগো, তুমি পালাও—চলো ওই সিঁড়ি দিয়ে—(দুজনে ছোটো ছোটো steps-এ দৌড়ে প্রায় footlight-এর কাছে যান—হঠাৎ বৌদি থেমে—) না, না, সিঁড়ি দিয়ে নয়—ওরা বোধহয় সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে—তুমি ওই জানলা দিয়ে পালাও—

(আবার সেইভাবে দৌড়ে পিছনের নির্দিষ্ট জানলার কাছে গিয়ে থামেন।)

নাও তুমি এই জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালাও।

শম্ভু। এই জানালা দিয়ে? (জানালা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে ভয় পান) এত উঁচু থেকে লাফাব?

বৌদি। হ্যাঁ, হ্যাঁ লাফাও—তুমি তো নায়ক—তুমি তো সহজে মরবে না—ওগো তুমি পালাও—তুমি বীর—তুমি পালাও !

শম্ভু। ‘বীর’ হয়ে পালাব—? (এক হাত দিয়ে কল্পিত জানালার গরাদ ধরেন এবং একটা পা সেই জানালার উপর রাখেন, রেখে বলেন) তা আমারও তো কিছু বলার দরকার—আমি কী বলব ?

বৌদি। বার্নড্ শ থেকে একটা ডায়ালগ বলো—

শম্ভু। বার্নড্ শ ?—আচ্ছা—(জানালা থেকে হাত-পা নামিয়ে একটু সাহেবি কায়দায় বলেন—) The night is calling me—me—me—আমার মনে পড়ছে না। আমি বরং তুলসী লাহিড়ির ‘পথিক’ নাটক থেকে বলি—(ফিল্মি ঢঙে) ‘আমি তো চললাম—আবার দেখা হয় কিনা কে জানে’,—

বলে জানলার নীচে তাকিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ার ভঙ্গি করেন এবং
লাফিয়ে নীচে থেকে ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বৌদি। (জানালা ধরে নীচের দিকে তাকিয়ে) আমি তো এখানেই থাকব—যদি মনে হয়—সময় পাও— (সেইরকম ভঙ্গিতেই—)

শম্ভু মিত্র নীচে থেকে হাত নাড়েন—বৌদি কান্নার ভঙ্গিতে মুখে হাত দিয়ে
জানলার কাছ থেকে দৌড়ে চলে আসেন ফ্রন্ট স্টেজ-এ।
যেন কান্নায় ভেঙে পড়েন
অমর এতক্ষণ নীচে দাঁড়িয়ে খৈনি খাচ্ছিল—
হঠাৎ যেন সে দেখতে পেল বাড়ির জানালা দিয়ে কে লাফিয়ে পড়ল।
সেই দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—

অমর। আরে খিড়কি-সে কিঁউ উতার আয়া। চোট্টা হোঙ্গে জরুর—আরে—পাকড়ো !

শম্ভু। এই সেরেছে—এ আবার কী ফ্যাসাদ—

শম্ভু মিত্র এবং অমর গাঙ্গুলি নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়েই
খুব জোরে দৌড়ানোর ভঙ্গি করেন
সেইভাবে দৌড়াতে দৌড়াতেই অমর চিৎকার করতে থাকে—
‘পাকড়ো, পাকড়ো’।
কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দুজনা থেমে যান—অমর মুখ

মুছতে মুছতে সামনের দিকে চলে যান—একটু গম্ভীর তার মুখ।

শম্ভু মিত্র ও বৌদি উৎসুক দৃষ্টিতে তার পেছনে পেছনে যান।

শম্ভু ও বৌদি। কী হল?—কেমন হল?

অমর। হল না—কিছুই হল না—

বৌদি। কিছুই হল না মানে—হাসি পেল না?

অমর। না। হাসি পেল না—

বৌদি। (শম্ভু মিত্রকে) কী, তোমারও হাসি পেল না?

শম্ভু। হ্যাঁ, আমার মানে,– একটু একটু হাসি পাচ্ছিল–

অমর। নায়ক হয়ে বসে আছেন–হাসি তো পাবেই–

বৌদি। তা হলে আপনার হাসি পেল না–

অমর। না, এতে আমার হাসি পেল না–

বৌদি। (ক্রমশ রাগতে থাকেন) তা হলে আপনার হাসি পেল না?

অমর। (ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে) না–পেল না–

বৌদি। তা হলে আপনার হাসি জীবনে কোনোদিন পাবে না।

বৌদি রেগে স্টেজ থেকে চলে যান—

শম্ভু। দিলে তো রাগিয়ে—

অমর। সত্যি কথা বলার দোষ—

শম্ভু। কে বলেছে সত্যি কথা বলতে? সংস্কৃত পড়নি—'মা ব্রূয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্,—

অমর। সংস্কৃতে তেরো পেয়েছিলাম বলে হেড পণ্ডিত ইস্কুলে আমাকে প্রোমোশন দেননি।

শম্ভু। তা হলে?

অমর। তা হলে—

শম্ভু মিত্র প্রথমে কোমরের পেছনে হাত রেখে এবং তাঁর পেছনে

অমরও সেই একইভাবে নিজের পিছনে হাত রেখে দাঁড়ান। বিশেষ ভঙ্গিতে।

সেইভাবে একবার স্টেজ-এর ডানদিক থেকে বাঁদিকে, একবার

বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঘুরতে থাকেন—মুখে ভীষণ চিন্তা—

হঠাৎ শম্ভু মিত্র অমরের পিঠে ধাক্কা দিয়ে বলেন—

শম্ভু। হয়েছে।

অমর। কী হয়েছে?

শম্ভু। জীবন কোথায়?

অমর। (বুকে হাত দিয়ে হার্টটা অনুভব করতে করতে) কোথায়?

শম্ভু। রাস্তায়, মাঠে, ঘাটে। এই চার দেওয়ালের মধ্যে, এই ঘরের মধ্যে জীবনকে উপলব্ধি করা যাবে না—হাসিও পাবে না—। সুতরাং চলো—বাইরে—হাসির খোরাক, পপুলার জিনিসের খোরাক পাবে।

অমর। চলুন—যাওয়া যাক—

দুজনে সেই জায়গাতেই দুবার বৃত্তাকারে ঘুরে—সিঁড়ির
কাছে আসেন এবং কল্পিত সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে আসেন।
দরজা বন্ধ করে দিয়ে যেন রাস্তা দিয়ে চলতে থাকেন
চারিদিকে দেখতে দেখতে। একটু হেঁটে তারপর এক জায়গায়
দাঁড়িয়ে থেকে আবার হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গি করেন।

শম্ভু। কই হে কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না।

অমর। হ্যাঁ, জীবনও শুকিয়ে যাচ্ছে—এ থেকে বোঝা যায়।

হঠাৎ একপাশ থেকে একজন লোক
একটা মোটর আঁকা ছবি ধরে মুখে হর্ন-এর আওয়াজ
করতে করতে ওদের ক্রস করে চলে যায়।
আর একটা লোক বাস-এর ছবি নিয়ে অন্যদিক
থেকে আসে। অমর যেন বাস চাপা পড়ছিল, শম্ভু মিত্র
টেনে নেন ও বাস ড্রাইভারকে বকে ওঠেন।
বাস ড্রাইভার নিজের ভাষায় চেঁচিয়ে ওঠে।
হাত-রিক্‌শার ছবি নিয়ে মুখে 'টুং টুং',
করতে করতে একটি লোক ঢোকে—চলে যায়।
শেষে একটা লোক ট্রামের ছবি নিয়ে ঢোকে—
মুখে ট্রামের ঘন্টির 'ঠ্যাং ঠ্যাং' আওয়াজ। সে সোজা রাস্তা ধরে—
মঞ্চের একদিক থেকে অন্য দিকে চলে যায়,
শম্ভু মিত্র বলেন—

শম্ভু। দেখেছ, ইংরেজ কোম্পানি কিনা—ঠিক লাইন ধরে চলেছে।

ওরা তখন হাঁটার ভঙ্গিতে পা নেড়ে চলেছেন—

শম্ভু। নাঃ কোথাও জীবনের খোরাক, হাসির খোরাক নেই।

হঠাৎ পেছন থেকে শোভাযাত্রীদের ক্ষীণ আওয়াজ শোনা যায়।
'চাল চাই, কাপড় চাই, চাল চাই, কাপড় চাই,' ইত্যাদি। শম্ভু মিত্র সেই
দিকে তাকিয়ে দূরে মিছিল দেখতে পেয়ে বলে ওঠেন—

শম্ভু। এই দেখো আবার মিছিল আসছে। এই নিয়ে নাটক লেখো— দেখো, পুলিশেও ছাড়বে না, আর লোকেও দেখবে না।

শোভাযাত্রীদের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আরও কাছে।
শম্ভু মিত্র উলটো দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন—

শম্ভু। এইরে—পুলিশ আসছে। লাগল ঝঞ্ঝাট। পালাও।

অমর। অ্যাঁ, বলেন কী?

দুজনে হাত ধরাধরি করে ডানদিকে পিছনের উইং দিয়ে পালিয়ে যান

মিছিল ঢোকে অভিনেতার বাঁ হাতের পিছনের উইং দিয়ে—
কয়েকজন মেয়ে এবং কয়েকজন ছেলে।
সামনের কয়েকজন হাতটা উঁচু করে থাকে।
যেন ফেস্টুন বা পতাকা কিছু ধরে আছে। খুব ছোটো ছোটো স্টেপ-এ
এগোয় তারা, আস্তে আস্তে মুখে বলতে থাকে—'চাল চাই',
'কাপড় চাই' ইত্যাদি। এরা কিছুটা ঢুকে গেলে অন্যদিক
থেকে অর্থাৎ অভিনেতার ডান হাতের গেট উইং দিয়ে
একজন সার্জেন্ট এবং দুজন পুলিশ অফিসার ঢোকে।
সার্জেন্ট বা পুলিশের পরিচ্ছদের মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই—
কেবল সার্জেন্ট-এর একটি ক্রস বেল্ট থাকে।
পুলিশের হাতে বন্দুক ধরে রাখার ভঙ্গি করে।
সার্জেন্ট মুখে বলতে বলতে আসেন
লেফট, রাইট, লেফট, রাইট—প্রায় ওদের কাছে এগিয়ে বলেন—
হল্ট্!

পুলিশেরা মার্চ বন্ধ করে—শোভাযাত্রীরা
একই জায়গায়—দাঁড়িয়ে চলার ভঙ্গি করতে
থাকে এবং ওই একই কথা বলে যেতে থাকে—

সার্জেন্ট। তোমরা ফিরে যাও। (কেউ উত্তর করে না—একই ভাবে স্লোগান দিতে থাকে—) তোমরা ফিরে যাবে কিনা?

শোভাযাত্রীদের মধ্যে সামনের মেয়েটি বলে ওঠে মেয়ে—'না'—

সার্জেন্ট। তোমরা ফিরে না গেলে আমি গুলি করতে বাধ্য হব।

শোভাযাত্রীরা পরস্পরের দিকে তাকায়।

উচ্চগ্রামে আবার শুরু করে 'চাল চাই, কাপড় চাই'।

সার্জেন্ট প্রচন্ড রেগে পুলিশের দিকে—

আর একবার মিছিলের দিকে তাকায়—পরে পুলিশদের বলে—

সার্জেন্ট। —ready, —aim—

পুলিশেরা বসে পড়ে—এবং কম্পিত বন্দুক তাগ করে ধরে—

হঠাৎ মিছিলের সামনের ছেলেটি খুব তীব্র গলায় বলে ওঠে—

যুবক। চাল চাই।

সার্জেন্ট। (আর না বলতে দিয়ে) ফায়ার—

বন্দুকের আওয়াজ হয়—একটি ছেলে ও মেয়ে চিৎকার

করে পড়ে যায়। শোভাযাত্রীরা সকলে বসে পড়ে।

তাদের মধ্যে একটা হাহাকার আর গোঙানি শোনা যায়।

পুলিশেরা মার্চ করতে করতে চলে যায়—

সারা স্টেজ তখন লাল আলোয় ভরে গেছে—অমর দৌড়ে ঢোকে—

আহত মেয়েটির মাথায় হাত দিয়ে দেখতে থাকে।

শম্ভু মিত্র ঢোকেন—অমরের পিঠে টোকা দিয়ে বলেন—

শম্ভু। কী অমর—এবার হাসি পাচ্ছে? (দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলেন) এবার নিশ্চয়ই লোকের খুব হাসি পাবে?

আস্তে আস্তে মঞ্চে পরদা নেমে আসে।

সমাপ্ত।

নানা রঙের দিন

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি

রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়	বৃদ্ধ অভিনেতা (৬৮)
কালীনাথ সেন	প্রম্পটার (প্রায় ৬০)

[পেশাদারি থিয়েটারের একটি ফাঁকা মঞ্চ। পিছনে রয়েছে রাত্রে অভিনীত নাটকের অবশিষ্ট দৃশ্যপট; জিনিসপত্র আর যন্ত্রপাতি। মঞ্চের মাঝখানে একটি টুল ওলটানো রয়েছে।...এখন রাত্রি। চারিদিকে অন্ধকার। দিলদারের পোশাক পরে প্রবেশ করেন রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর হাতে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি। হাসছেন তিনি।]

রজনী : আচ্ছা, ব্যাপারটা কী বলো তো? কী গেরো! ঘুমোলুম তো ঘুমোলুম একেবারে গ্রিনরুমে? নাটক কখন শেষ হয়ে গেছে, হল ফাঁকা, শাহাজান-জাহানারা সব পাত্রপাত্রী ভোঁভোঁ—আর আমি দিলদার—এতক্ষণ পড়ে পড়ে গ্রিনরুমে নাক ডাকছিলুম। ধুর, বারোটা বেজে গেছে আমার—বারোটা বেজে পাঁচ। রাত কত হল কে জানে। এত টানলে কি আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে? চেয়ারে পড়েছি আর ঘুম! বাঃ বাঃ বুঢ্‌ঢা। আচ্ছাহি কিয়া। ক্যায়া হোগা তুম্‌সে? কুছ্ নেহি। বিলকুল কুছ্ নেহি। [চেঁচিয়ে]